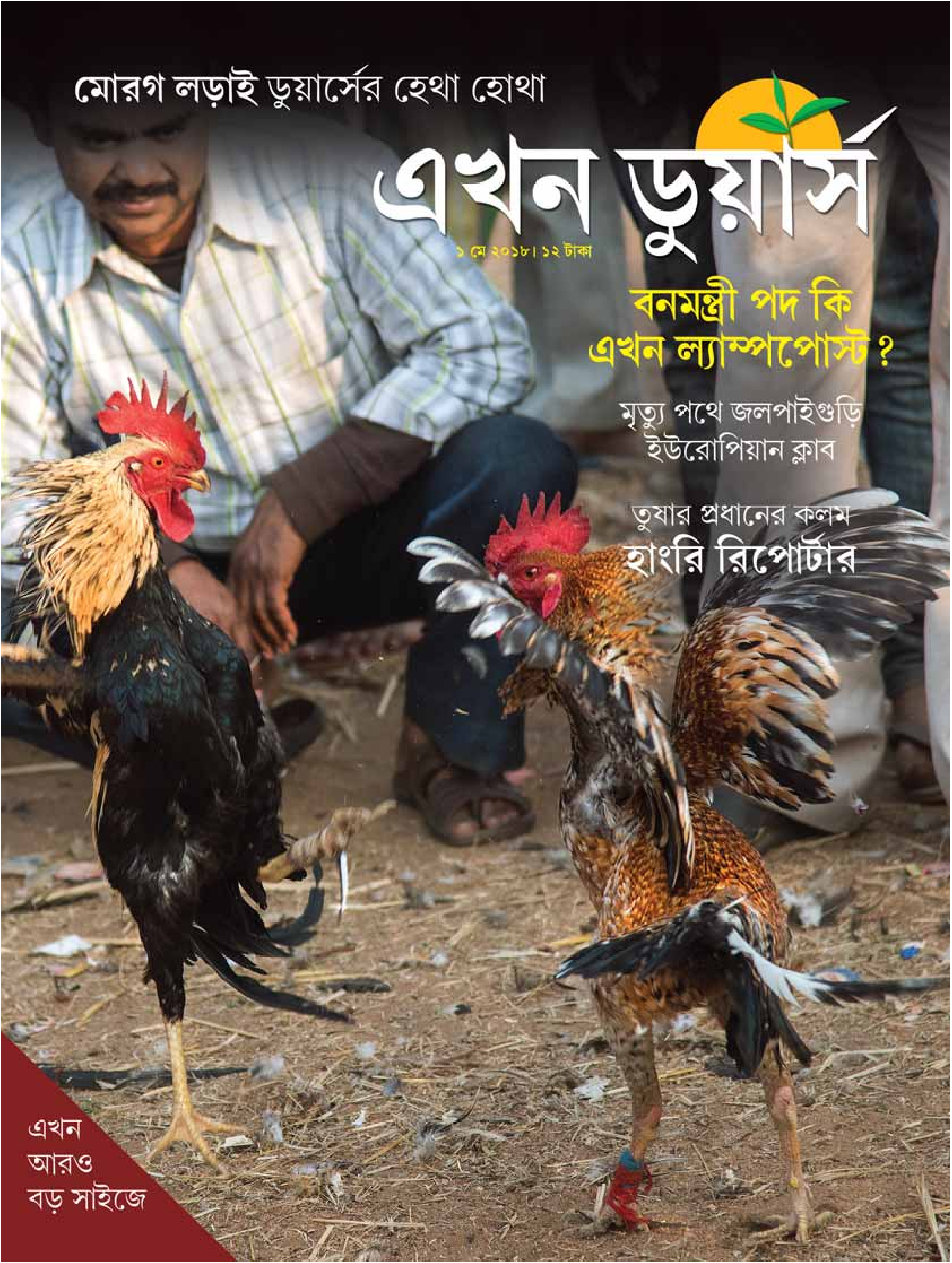

মোরগ লড়াই ডুয়ার্সের হেথা হোথা

এখন ডুয়ার্স

১ মে ২০১৮। ১২ টাকা

বনমন্ত্রী পদ কি এখন ল্যাম্পপোস্ট ?

মৃত্যু পথে জলপাইগুড়ি ইউরোপিয়ান ক্লাব

তুষার প্রধানের কলম
হাংরি রিপোর্টার

এখন আরও বড় সাইজে

স্বাগতম

জলপাইগুড়ি পুরবাসীর জন্য উপহার

আমরুত - ১৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে তিস্তার জলকে পরিশ্রুত পানীয় জলের উপযোগী করে শহরবাসীকে পরিষেবা দেওয়ার কাজ চলছে।

- কান্তেশ্বরী পার্কের সৌন্দার্যয়ন ও নির্মাণ করা হয়েছে ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে।
- জে ওয়াইএম এ পার্কের সৌন্দার্যয়ন ও নির্মাণ করার কাজ চলছে।

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

এখন ডুয়ার্স

পঞ্চম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ২০১৮

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৫

হাংরি রিপোর্টার

ম্যাক উইলিয়াম স্কুলকে তখন মনে হত বিশ্ববিদ্যালয়! ৮

প্রতিবেশি পিএনপিসি

কোচবিহারের কড়চা— গোসানীমারি ১২

পাহাড় পর্ব— মকাইবাড়ি আজও ‘রাজা’ই ১৩

উত্তর সম্পাদকীয়

বনমন্ত্রী পদটি কি এখন শুধুই ‘ল্যাম্পপোস্ট’? ১৬

উত্তরের পরিবহণ

হলদিবাড়ি চিলাহাটি রেলপথ ১৭

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

মোরগ লড়াই ডুয়ার্সের হেথা হোথা ১৯

পর্যটন

লাটপাঞ্চার ২৪

ডুয়ার্স আমার মাতৃভূমি

মাল নদীর চর ২৭

উত্তরপক্ষ

মৃত্যুপথে একদা জলপাইগুড়ির অভিজাত ক্লাব ২৮

খেলাধুলায় ডুয়ার্স

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী লোকক্রীড়া ২৭

ধারাবাহিক ডুয়ার্স

শালবনে রক্তের দাগ ৩২

ডুয়ার্স থেকে শুরু ৩৮

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ৪৮

নিয়মিত বিভাগ

খুচরো ডুয়ার্স ৬

ডুয়ার্সের চা-বাগান চিনুন ৪৩

প্রচ্ছদ ছবি: নির্মাল্য ভট্টাচার্য

সম্পাদনা ও প্রকাশনা প্রদোষ রঞ্জন সাহা **ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান** শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল **অলংকরণ** শান্তনু সরকার
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া, **মুদ্রণ** অ্যালবাট্রস
ইমেল ekhonduars@yahoo.com

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এখন ডুয়ার্স পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি

হলিডে ইয়ার, হরেন মুখার্জি রোড ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬
বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড ৯৪৩৪৩২৭৩৪২

শিবমন্দির

অনুপ দাস, শিবমন্দির বাজার ৯৮৩২০২৯৫১৪

জলপাইগুড়ি

ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
বিজয় ঝা, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ৮৫৩৮৮২২৪০৪

মালবাজার

সম্রাট (হোম ডেলিভারি) ৯৩৩২০০৫৮৬৫

চালসা

দিলীপ সরকার, চালসা মোড় ৯৭৭৫৪১৫১৪৪

বিন্নাগুড়ি

রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল ৯৪৩৪৮০৯৫৯০

বীরপাড়া

বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২

মাদারিহাট

জগৎ চৌধুরী (হোম ডেলিভারি) ৯৭৪৯৭২৫৭৮১

লাটাগুড়ি

সৌমেন (হোম ডেলিভারি) ৯০০২৪০৯৮৯৩

ময়নাগুড়ি

দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮

ফালাকাটা

অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯

আলিপুরদুয়ার

দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
শ্যামলি বুক ডিপো (০৩৫৬৪) ২৫৫৪১৮

কোচবিহার

সার্থক পণ্ডিত (হোম ডেলিভারি) ৭০০১২৬৩২৮৬
জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাচারি মোড় ৯৮৫১২৩৪৮৮৯

মাথাভাঙা

বরুণ সাহা (০৩৫৮৩) ২৫৫৫৭৭

মালদা

অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি ৯৯৩২৯৬৭৯৯১

রায়গঞ্জ

সুরঞ্জন সরকার, বাস স্ট্যান্ড ৯৪৩৪৪২৩৫২২

বালুরঘাট

মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক বিশাল বুক সেন্টার ৪০৬৪৪০৯৭

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

ডুয়ার্সের ইকো রিসর্টে এই প্রথম অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস

DHUPJHORA SOUTH PARK

Murti, Gorumara NP
Jalpaiguri, West Bengal

Accommodation: Super Delux Room (DBR) 4 nos, Delux Ethnic Rooms (DBR) 4 nos, Standard Family Rooms (4-6 BR) 5 nos.

Facilities: Tea Maker, Cold/Hot running water, attached toilet in every room;

Common Dine-in place for breakfast-lunch- evening snacks-dinner, Conference Hall;

Cycling, Angling, Adventure sports like Burma Bridge, Cylinder Walk, Bosun Chair, Commando Walk and Zip Line.

Marketing & Booking Contact:
Kolkata 9903832123, 9830410808
Siliguri 9434442866, 9002772928

মোহিনী
মূর্তির পাড়ে
আয়েশের
সঙ্গে মেশে
রোমাঞ্চ

সম্পাদকের ডুয়ার্স

ধর্ষণ বিক্কিরি হয় ভাল

'ধর্ষণ' একটি গুরুতর অপরাধ, আইনের চোখে। ঈশ্বরের চোখে তা পাপ। নারীর চোখে তা একরকম হত্যা। কিন্তু বাকি পুরুষের চোখে আসলে তা কী?

বিশাল আমাদের দেশ। সে দেশে নাকি প্রতি চোদ্দ মিনিটে একটি ধর্ষণ হয়! কারা এই তথ্যটি অংক কষে বের করেছেন তা জানা নেহ, তবে নিশ্চয়ই পুলিশের বা মিডিয়ার কাছে রিপোর্ট থাকা মোট ধর্ষণের সংখ্যাকে সময় দিয়ে ভাগ করে এই ভয়ংকর তথ্যটি বেরিয়েছে? কিন্তু শুনলেই মনে হয় যেন নিজের মহল্লাতেই চোদ্দ-পনেরো মিনিট পরপর কোথাও না কোথাও কোনও মহিলা বা যুবতী বা কিশোরী কিংবা শিশুকন্যা আর্তনাদ করে উঠছে, কান পাতলেই যেন তা শোনা যাবে। ভাবলেই বুকের ভেতরটা কেমন ছ্যাঁৎ করে ওঠে, কুড়ি বছর আগে হলেই যা আগুন হয়ে জ্বলে উঠত। টোটোয় পাশে বসা কিশোরীটির তার মায়ের সঙ্গে ফোন-ঝগড়া কানে আসে, উফ্ পারি না বাবা, এতবার যে ফোন করো না, বললাম তো আসছি। মনের চোখে অজান্তে ভেসে ওঠে মেয়ের মায়ের মুখ— কপালে পার্মানেন্ট উদ্বেগের ভাঁজ আর নাকের ডগায় জমা বিন্দু বিন্দু ঘাম। তখন মনে হয় সত্যিই মানুষের হিঁতৈষী মিডিয়ার বিপণনের এই আধুনিক উদ্দেশ্য বোধহয় 'সাকসেসফুল'। বিপন্ন নারীকে রক্ষার পথ বাতলাতে পারো না পারো, তার মনে ভয়টা সুচারুভাবে ঢুকিয়ে দাও, যা তার মধ্যে গেঁথে বসবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। আর অঘটন ঘটলেই নারীবাদীদের পথে নামাও, শহরের সব মানুষকে পথে নামাও, হাতে মোমবাতি আর প্ল্যাকার্ড ধরিয়ে দাও, পারলে তাদের ক্ষেপিয়ে দাও। তবেই না বিকোবে কাগজ, নিউজ আওয়ারের ব্রেকিং নিউজ, বিকোবে স্কোয়ার সেন্টিমিটার বা দশ-কুড়ি সেকেন্ডের স্পট!

'মনোবিদ্যা বলে, ধর্ষণের খবর বা বর্ণনা কিংবা চিত্র আসলে যে পুরুষ হরমোনে লহর তোলে তা বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু পুরুষ তারপর কী করে তা নির্ভর করে তার মনন ও চেতনার উপস্থিতি কিংবা অভাবের উপর। অচেতন মানুষ তাই ঘরে-জঙ্গলে-ক্লাসরুমে নারীর সম্মান হানি করে নির্বিকার উন্মাদনায়। আর 'সচেতন' মধ্যজীবীরা তাদের শহরের নরম গদিতে বসে শুয়ে সেই খবরের ব্যবচ্ছেদ করে গোপন সুখ লাভ করে।'

যেমন নির্ভয়ার বছর কয়েক পর কাঠুয়া আবার দেশের মানুষকে যেন 'জাগিয়ে' তুলল। এখন মহল্লায় মহল্লায় ধর্ষণ বিরোধী মিছিলের ছবি রোজ কাগজের পাতায়, টিভির পর্দায়। কিন্তু মাঝখানের এই কয়েক বছর চোদ্দ মিনিটের হিসেবে দেশে বছরে ক' হাজার ধর্ষণ ঘটেছে তা হিসেব করে দেখেছেন কেউ? তার মধ্যে ক'টি ঘটনা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমগুলি হইচই ফেলে দিয়েছিল তা হাতে গুণে বলা নিশ্চয়ই খুব একটা কঠিন কাজ হবে না? সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, বিত্তের সমাগম বা ভোগবাদের হাত ধরেই বেড়ে উঠেছে পুরুষের রিপু, অনিয়ন্ত্রিতভাবে এবং অশিক্ষিত উপায়ে, তার সঙ্গে শতাব্দীর পর শতাব্দী লালিত গোঁড়ামি তো ছিলই। অনিয়ন্ত্রিত রিপু দুর্বল স্ত্রী লিঙ্গে বলপূর্বক বীর্যপাত করে, যা সমাজের চোখে বেআইনি, ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। অথচ অশিক্ষিত রিপু বৈধতার ছাড়পত্র নিয়ে মৈথুনের নামে স্ত্রীকে বলাৎকার করে রোজ, কোনওকালেই তা অন্যায় বলে মানেনি এই সমাজ বা আদালত। আলোচনা লেখালেখি করে পৃথিবীর সব দোয়াতের কালি আজ নিঃশেষিত। কিন্তু ধর্ষণ বন্ধ হওয়ার বদলে বহুমাত্রায় বেড়ে গিয়েছে বললে কি আজ অত্যুক্তি হবে? শিশুদের উপর যৌন অত্যাচারও যে সভ্যতা এগিয়ে চলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে, এতদিনের এলিট ক্লাসে চর্চিত এই অসুখ যে আজ সমাজের নীচুতম তলাতে পৌঁছে গিয়েছে সে কথা বললেও নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি হবে না?

মনোবিদ্যা বলে, ধর্ষণের খবর বা বর্ণনা কিংবা চিত্র আসলে যে পুরুষ হরমোনে লহর তোলে তা বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু পুরুষ তারপর কী করে তা নির্ভর করে তার মনন ও চেতনার উপস্থিতি কিংবা অভাবের উপর। অচেতন মানুষ তাই ঘরে-জঙ্গলে-ক্লাসরুমে নারীর সম্মান হানি করে নির্বিকার উন্মাদনায়। আর 'সচেতন' মধ্যজীবীরা তাদের শহরের নরম গদিতে বসে শুয়ে সেই খবরের ব্যবচ্ছেদ করে গোপন সুখ লাভ করে। অতএব 'ধর্ষণ' একটি লালিত অপরাধ, একটি বিক্রয়যোগ্য প্রডাক্ট, যার পেছনে থাকে সম্মিলিত হাত, ফলে তার সমাধানের পথ আজকের দিনেও বের হওয়াটা অসম্ভবের পর্যায়ে চলে গিয়েছে।

প্রশাসনিক অকর্মণ্যতার দোহাই বা দোষ দেওয়া হয়, যা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু প্রশাসনিক কড়াকড়ি ব্যবস্থা ধর্ষণের মাত্রা কমাতে একমাত্র 'অব্যর্থ দাওয়াই' বলে মেনে নেওয়া যায় না। বরঞ্চ একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে লাঞ্ছিতা সংকুচিত অর্ধমৃত নারীকে জাগানোর জন্য কী কী পথ রয়েছে সেটাও বের করা বোধহয় আবশ্যিক। প্রশাসনের উপরের দিকে নারীদের অবস্থান আজ নতুন কিছু নয়, কিন্তু তাও কি কোনও বদলের সম্ভাবনা উঁকি দিয়েছে কোথাও? বরং বদল হলে জানি তাতে বাধা দিতে পারে সংসার ভেসে যাওয়ার মেয়েলি সংস্কার-ভীতি, আর্থিক নিরাপত্তার কল্পিত অভাব। ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়ত 'বলাৎকারপূর্বক হত্যা'র মতো পৈশাচিক প্রবৃত্তির অণ্ডকোষে সজোরে লাথি মারতে পারত, সন্দেহ নেই। কিন্তু একই সঙ্গে শুরু করতে হত মেয়েদের সাহস বাড়াবার এক্সারসাইজ। আর তা শুরু করতে হবে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই পাঠ্যসূচির সঙ্গে আবশ্যক হিসেবে। পাঠ্যসূচিতে এই যুগান্তকারী বদল আনবার জন্য সদর্থক কিছু করতে পারে দেশের আইনসভা। প্রশ্নটা ওঠে এখানেও, আইন তো হল, এরপর আইন মেনে ধর্ষকদের দ্রুত শাস্তির বন্দোবস্তও হল। কিন্তু মেয়েদের সাহস মনোবলে পরিবর্তন আনবে কে? তার জন্য তো প্রয়োজন ঈশ্বর প্রেরিত দূতের। কিন্তু আপাতত সে গুড়ে বালি, যুগে যুগে পাঠালেও ভগবান এই যুগে দূত পাঠাবার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছেন।

সোশ্যাল মিডিয়াতে মগ্ন হয়ে আছে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। এতে কারও কারও রাগ হলেও মেনে নিতে হবে, নতুন মিডিয়া সব সময়ই প্রথম দিকে কয়েকটা বছর টানা জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থাকে। তবে সাময়িক পরিস্থিতি মানলেও এই মিডিয়া এসময় নারী চেতনায় বদল আনতে কতটুকু এগিয়ে আসতে পারল সেটাও একটা বড় প্রশ্ন। নারী পরস্পরের সঙ্গে গলা জড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোনও আড্ডায় বা গানের মেহফিলে বা পরচর্চায় বসে থাকতে পারে না আজ, নতুন মিডিয়ার অদৃশ্য দানো তাকে বারবার চেয়ার থেকে তুলে দেয়, কিংবা বসে থাকলেও বাধ্য করে মোবাইলের পর্দায় চোখ আটকে রাখতে। সভা-অনুষ্ঠান চলার সঙ্গেই তাই সেলফি তোলার ধুম পড়ে শ্রীমতিদের হাতের সুদৃশ্য মোবাইল সেটে, কোনওটাই যে ছাড়া যাবে না! ফেসবুক পাতার দ্রুত ওঠানামায় বারবার জিজ্ঞাসা ওঠে, চিরকালই কি তারা নিজেদের খোলে গুটিয়ে রাখতে ভালবাসে? নারীমুক্তি কি তবে পুরুষেরই বের করা কোনও আজব কল্পনা? নারীকে পণ্য করার জগৎজোড়া প্র্যাকটিস কি আদৌ বন্ধ করা সম্ভব? মিডিয়ার তবে চলবে কী করে?

খুচরো ডুয়ার্স

জুয়াশ্রী

কথায় বলে, ‘ওরা খেলে মাঠে আর এরা খেলে হাটে’। মানে হাটে-বাজারে-রাস্তায়। আইপিএল নামক ডাংগুলি খেলার তালে তালে এবং তলে তলে ডুয়ার্সেও যে জুয়াপিএল চালু হয়ে যেত, তা সক্কলেই জানত। সে খেলায় কী নেই! মোবাইল-ল্যাপটপ-ওয়েবসাইট-লটারি কাউন্টার-চিরকুট প্রদান —এক কথায় পুরো ইনফ্রাস্ট্রাকচার রেডি। তা সেদিন কী হয়েছে কে জানে! জলপাইগুড়ির কোতয়াল গাড়ি হাঁকিয়ে, সেপাই সান্ত্রী নিয়ে টাউন থেকে দুই খেলুড়েকে বোল্ড করে শুরু করলেন নয়া ইনিংস। তারপর ময়নাগুড়িতে, শিলিগুড়িতে ঝপাঝপ উইকেট পড়তে শুরু করে দিল জুয়া টিমের। তা হলে কি জুয়াপিএল এন্ড হল কত্তা? দুর! তা কি হয়? আনপসেবেল! পুলিশ যাদের হারিয়েছে তারা হল উত্তর কোরিয়ার বি ডিভিশনের ক্রিকেট টিম। এদের কোচিং হত কলকাতার বড়বাজার থেকে। বড়বাজারকে কারা কোচিং দিত, সে প্রশ্ন করো না। আইপিএল-এ চাপ পড়তে পারে।

গোষ্ঠী মামলা

দ্বন্দ্বের কথা সবাই জানে। এ গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীকে যষ্ঠি নিয়ে তাড়া করছে বা গালি দিয়ে ষষ্ঠীপুজো করছে— এমনটা তো হয়েই থাকত। কিন্তু মেগাদিদি বামদের ফরগিভ করে দিলেও মার্ক্সবাবুর ডায়লেকটিক নিয়ে নিয়েছেন। সেটা ‘গোষ্ঠী ডায়লেকটিক’ নামে খ্যাতিমান হচ্ছিল। হেনকালে প্রায় খাল কেটে আদালত আনয়ন করে ফেললেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের দুই ‘অনুপ্রাণিত’ প্রার্থী। সেখানে দুই নারী হাতে তরবারি নিয়ে দাবী করছিলেন উভয়ই দলানুমোদিত একমাত্র প্রার্থী। দু’-জনের পক্ষেই এত কড়া প্রমাণ আর এমন সুক্ষ্ম সমর্থন যে দল নিজেই কনফিউজড! কাকে সে দিয়েছিল

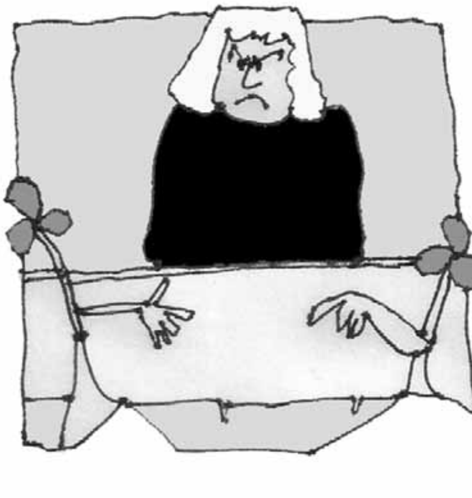

প্রার্থী হিসেবে? এমতাবস্থায় হাইকোর্টে মামলা ছাড়া উপায় কী? কনফিউজড দল অবশ্য এ নিয়ে সাইলেন্ট। মামলা মানেই অশনি সংকেত! দলে দ্বন্দ্বের অভাব নেই। এদ্দিন তবুও বলে-কয়ে-বোমায়-গুলিতে মেটান যাচ্ছিল। এবার যদি সবাই আদালতে যায়, তবে??? কী কাণ্ড! দল কাকে অনুমতি দেবে তা যদি হাইকোর্ট ঠিক করে তবে দিদির কী হবে কত্তা?

বিরুদ্ধ ব্যাঘ্র

বিরোধিরা আক্ষরিক অর্থেই বাঘ হয়ে গেলে যা হয়! এমনিতে ভালই চলছিল। বিরোধিরা মনোনয়নের দিন কপালে নয়ন তুলে ফিরে গেছে। যে ক’টা আছে সহজেই ম্যানেজ করা যাবে। এবার ভোট পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে প্রচার, মিটিং আর খাওয়া-দাওয়া —এই ছিল প্ল্যান। কিন্তু সে গুড়ে বালুকা, মানে বাঘের থাবা! এমনিতেই জোড়া অরণ্যের মাঝে এই এলাকায় চিতারা মাঝে মধ্যে প্রচারে আসেন। পঞ্চায়েতের দিনক্ষণ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তারা এমন তেড়েফুঁড়ে ময়দানে নামবেন, কে তা জানত? তাই সন্ধের পর যখন প্রচার-মিটিং-এ বাজার হাট উত্তেজিত হয়ে ওঠার কথা, তখন সব্বাই ঘরে দোর দিয়ে বসে আছে গো! দোপেয়ে বিরোধি হলে না হয় পুলিশের সামনেই দুটো থাপ্পড় লাগিয়ে মামলা ঠুকে দেওয়া যেত। কিন্তু এইসব হলদে কালো চারপেয়ে বিরোধি মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। ব্যাটাগুলো মোটেই সরকারী-বিরোধির ফারাক বোঝে না। শুধু গরু-ছাগলের দিকে নজর! পথের বাঁকে বাঁকে দন্ডায়মান উন্নয়ন দেখতেই পায় না! রামশাই গ্রামের এদিক ওদিকের সংবাদ।

লটারিক্ত

‘ফালাকাটার স্টেশানবাবু লোকটি ছিল শান্ত/ তাঁর যে অমন লটারি ব্যামো/ কেউ কখনো জানত?’ না না! কেউ জানত না। তাই জানার পর খুব চমকেছে ফালাকাটার পাব্লিক। স্টেশানের সুপারবাবু দিব্যি হাসিখুশি মানুষ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ফালাকাটা চষে বেড়ান আর লটারির টিকিট কাটেন। কাটতে কাটতে পকেট ফাঁকা হয়ে যায়। তবুও

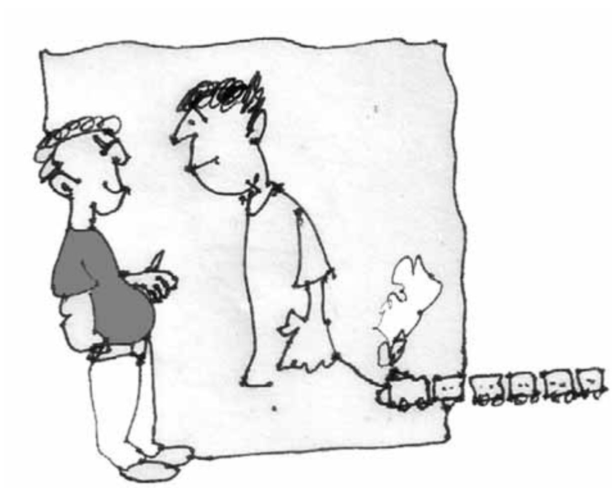

কাটেন। তাঁকে দেখলেই লটারিওয়ালাদের হাসি চওড়া হয়। কিন্তু এত্ত এত্ত লটারির টিকিট কাটতে তো পয়সা লাগে কত্তা! সুপারের মাইনে কি শাহরুক খানের চাইতে বেশি? আরে, সেখানেই তো মজা! এই তো সেদিন পুলিশ এসে সুপারবাবুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। কেন গ্রেপ্তার জানতে চাইছিস তো? ক’-দিন আগে আলু নিয়ে যাবে বলে একখানা মালগাড়ি ভাড়া করেছিল কেউ লাখ পনের দিয়ে। সুপার নাকি সে ভাড়া নিজের খাতায় জমা করে দিয়েছে। তারপর নাকি স্বীকার করেছে যে লটারির বিল মেটাতেই এই কাণ্ড! যা ব্বাবা! লটারিতে রিক্ত হয়ে মালগাড়ির ভাড়া খেয়ে ফেলেছিলি? বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না স্যার?

খুচরো ডুয়ার্স

বিনা মদে

সেদিন হঠাৎ মদালয়ে কয়েকজন নতুন খরিদ্দার হাজির। যাঁরা বসে চুমুক দিচ্ছিলেন, তাঁরা সরে গিয়ে বসার জায়গাও করে দিচ্ছিলেন। কিন্তু মালিকবাবুর মগজে তক্ষুনি জ্বলে উঠল হাজার ওয়াটের এলইডি! নয়া কাস্টমারের একটাকে দেখতে সিভিক পুলিশের মতো লাগছে না! ভাবতেই সটকে পড়ার তাল করতেই খরিদ্দারেরা হাঁ হাঁ করে তেড়ে এসে বলল, 'যাবেন না! যাবেন না! আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। লাইসেন্স বিনে দোকানে দারু বেচা হচ্ছিল, অ্যাঁ!' বোঝা গেল তেনারা সব সাদা পোষাকের পুলিশ। কিন্তু মালিকবাবুও কম কী! দিলেন ছুট! সিভিক পুলিশ খপাৎ করে তাঁর প্যান্টালুন চেপে ধরল। তিনিও দিলেন টান। প্যান্টালুন এল সিভিকের হাতে আর বডি দিল পা নিয়ে দৌড়! সোজা পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে সে বডি সাঁতার কেটে ওপাড়ে উঠে গাছপালা-খেত-মাঠের মধ্যে দিয়ে ভ্যানিশ! যাঁরা দোকানে বসে খাচ্ছিলেন তাঁরা এ সুযোগে চম্পট দিতেই পারতেন, কিন্তু দিতে পারেননি। মালিকবাবুর স্কিল দেখে নেশা ডাবল হয়ে গেছিল তাঁদের। সে ব্যাটা বেচে, খায় তো না! বিনা মদে এমন কাণ্ড ঘটান সম্ভব? ধূপগুড়িতে এসব ঘটছে বটে!

পরিবর্তন

পরিবর্তন তো ঘটেই চলেছে, তাই না গুরুদেব? 'কাল ছিল লাল যারা গেরুয়াতে যায় চলে' —এমনই তো লিখেছিলেন কবি। তবে কেবল আমাদের মতো দোপেয়েদের পরিবর্তন দেখলে কিন্তু চলবে না গুরুজী! চারপেয়েদেরও দেখতে হবে। এই যেমন হাতিবাবুদের কথাই ধরুন। গেরস্ত ফসল ফলাতেই তারা এসে খেয়ে যেত। ন্যাচারাল ল। তা, ফসল তো আজও ফলছে। ওই তো, খেত ভরা ভুট্টা! কিন্তু কই! হাতিরা তো ফিরেও তাকাচ্ছে না। মাঠ ভরা ফসল অবহেলায় ফেলে দিয়ে তারা হানা দিচ্ছে গেরস্তের রান্নাঘরে। ভদ্দর জানোয়ার তো! তাই রান্নাঘরের দরজা না ভেঙে দেয়ালটা ভাঙে। তারপর খেয়ে চলে যায় চাল-ডাল-নুন। তবে কি গুরুদেব হাতিদের মধ্যেও পরিবর্তন এল? তারা ধান না খেয়ে চাল খাচ্ছে। ভুট্টা না খেয়ে পপকর্ন। আরে না না! আমি বলছি না গুরুজী! আমি তুশ্চু মানুষ। এক্সপার্টরা সন্দেহ করছে। খাওয়ার রুচিতে নাকি পরিবর্তন আসছে হাতি সমাজে।

জোট

রায়গঞ্জের করনদিঘি ব্লকের মিঞাভাই ভারি চিন্তায় পড়েছিলেন। তাঁর পাড়ার আসনটি মেয়েদের জন্য। সেখানে দলের প্রার্থী খোঁজার দায় তাঁর ওপরেই পড়েছে। কিন্তু মেয়ে কই? শাসক দল হলে না হয় এতক্ষণে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যেত, কিন্তু বিরোধি দলের যে একজনও জুটছে না! তবে উপায়? হঠাৎ কে জানি বলল, তোমার একটা বউ ছিল না? বউ? মিঞা সাহেব লাফিয়ে উঠলেন! ছিল তো! বছর ছয়েক হল রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গিয়ে আর আসেনি। তা বউ তো মেয়ে। সে প্রার্থী হতে পারে না? উত্তেজিত মিঞা সাহেব চললেন শ্বশুর বাড়ি। তারপর? দীর্ঘ ছয় বছর পর দেখা। অ-নে-ক কথার পর অবশেষে বউ রাজি। শ্বশুর বাড়ি ফিরে এসে পুনরায় জোট বাঁধলেন স্বামীর সঙ্গে। ফলে বউ আর দলীয় প্রার্থী নিয়ে মিঞাভাই এখন ভারি ব্যস্ত।

টুক্রাণু

পঞ্চায়েত উপলক্ষ্যে ডুয়ার্সে শ্বাশুড়ি বনাম পুত্রবধূ, শ্বশুর বনাম জামাই, মাসী বনাম ভাগ্নীদের লড়াই-এর খবর। বাগডোগরা বিমান বন্দর ক্রমশঃ হাটে পরিণত হচ্ছে। মালবাজারে কালীবাড়িতে পুজো দিতে এসে গ্রেপ্তার দশ ফুটি গোখরো। ভোটের উত্তেজনায় নাগ্রাকাটায় এক হাতি গুন্ডা হয়ে গেছে। ভোট তো দেব,

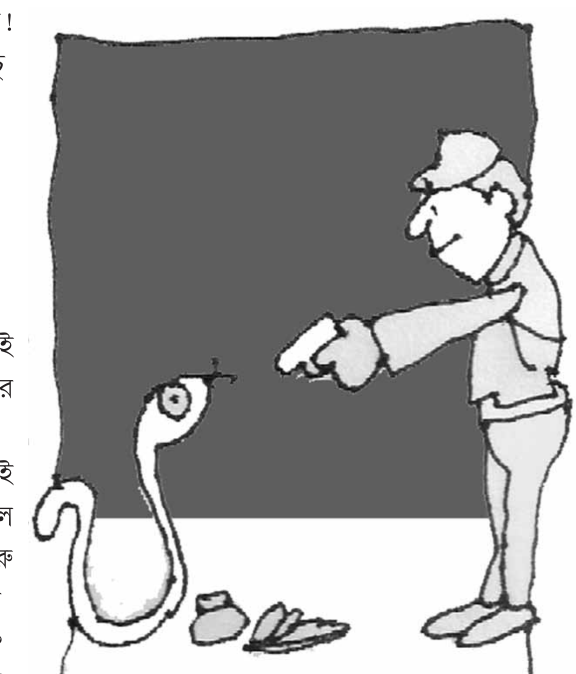

কিন্তু 'শি' দেব কোথায় —শৌচাগার না হলে ভোট নয় বলে হুঙ্কার চালসায়। ওদিকে, কোচবিহারে, মাসীর বাড়ি চলে এসেছেন মদনমোহন।

ম্যাক উইলিয়াম স্কুলকে তখন মনে হত বিশ্ববিদ্যালয় !

হাংরি রিপোর্টার

গত আশির দশকের গোড়া থেকেই শুরু হয় উত্তরবঙ্গের নিজস্ব দৈনিক পত্রিকা। একে একে বাংলা, হিন্দি এবং নেপালি। আজ সবকটিই সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে শুরুটা সহজ ছিল না মোটেই। আর শুরুর আগের প্রস্তুতিপর্ব ছিল সত্যিই আরও কঠিন। সেই মোক্ষম সময়ে ডুয়ার্সের সংবাদ-সংগ্রাহক যে তরুণটি জান লড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর ক্লান্তিহীন পরিশ্রম বিফলে যায়নি। তিনিই ছিলেন উত্তরের সাংবাদিকতার প্রধান মুখ। **তুষার প্রধান**। ওরফে মনোজ রাউত। গত চার দশক ধরে তাঁর ঝুলি ভরতি হয়েছে অভিজ্ঞতায়, বহু নামী মানুষের সান্নিধ্যে-সাক্ষাৎকারে। উত্তরের নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকরা তাঁর নাম ও কাজের সঙ্গে সম্যক পরিচিত নন। ‘এখন ডুয়ার্স’-এর পাতায় শুরু হয়েছে সেই অনাদৃত কলমচির সাংবাদিক জীবনের অজানা কাহিনি। সঙ্গে থাকছে অনেক দুর্মূল্য ছবি। এবার দ্বিতীয় পর্ব।

৩

উত্তরবঙ্গ সংবাদ। কলেজ রোড। শিলিগুড়ি। বিধান মার্কেটের ভেতর থেকে এরকম একটা সাইনবোর্ড রিকশায় করে নিয়ে আসা থেকেই আমার কপালে অল্প অল্প করে ঘাম জমতে শুরু করেছিল। কলেজ রোডের বইপাড়া লাগোয়া চিত্ত বসুর বাড়ির দোতলার কোণে রাস্তামুখী করে সাইনবোর্ডটা লাগান হয়ে যাওয়ার পর বুক ভরে আনন্দের দাপাদাপি টের পেয়েছিলাম। বিধান মার্কেটের আলোছায়া চিত্রালয় থেকে এর কিছুদিন আগে পর্যন্ত সাদা কাপড়ের ওপরে নীল কালিতে লেখা উত্তরবঙ্গ সংবাদের জন্য কিছু ব্যানার তৈরি করিয়ে উত্তরবঙ্গের বড় বড় শহরে লাগিয়ে আসার কাজ করেছি। কিন্তু এত আনন্দ কখনও পাইনি। এই সাইনবোর্ড ঝোলান হয়ে যেতেই আমার মনে হয়েছিল, আমি যেন ডানা মেলে উড়তে শুরু করেছি।

জৈন্তি নদীর বক্ষে তুষার। এই নদীর বুকে কত শিলা জমে জমে আজ বিষাদ পাথর। ছবি: বিজয় দাস।

একটা দৈনিক সংবাদপত্র হবে উত্তরবঙ্গের বুকে। বাংলা দৈনিক। সেই সংবাদপত্রের প্রথম 'স্টাফ রিপোর্টার' হব আমি, এত একেবারেই যেন নির্ধারিত ছিল। কিন্তু শেষমেশ আমার রিপোর্টার হওয়া আর হল না। যে কাগজকে উত্তরবঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে প্রতিষ্ঠা দিতে যাবতীয় হ্যাংলাপনায় নিজেকে নিংড়ে চলেছিলাম, যে কাগজ ভূমিষ্ঠ হওয়ার এক বছরেরও বেশি সময় আগে থেকে নিজেকে উত্তরবঙ্গের বুকে তার একমাত্র প্রতিনিধি সাব্যস্ত করেছিলাম, সেই কাগজ শেষ পর্যন্ত আমাকে 'রিপোর্টার'-এর চাকরি দিল না! আমাকে রিপোর্টার হওয়া থেকে বঞ্চিত করার পেছনে নিশ্চয়ই মালিক-সম্পাদক সুহাসচন্দ্র তালুকদারের দূরদৃষ্টি কাজ করেছিল। সেই পর্বে যেহেতু সাহিত্যের হাংরি জেনারেশন ভাবধারার এক ক্রোধী কবি হয়ে উঠেছিলাম, সেই কারণেই আমার যারপরনাই বদনাম হয়েছিল হয়তবা। অন্যদিকে কলেজে সায়েন্স বিভাগের সহপাঠী গৌতমেন্দু রায়, সে-ও রিপোর্টার হতে চেয়েছিল তখন। কিন্তু সুহাস তালুকদার গৌতমেন্দুকে রিপোর্টার পদে নিতে রাজি হননি। ওকে এবং আমাকে, দু'জনকেই বিজ্ঞাপন বিভাগের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। এই যে বলপূর্বক ঠেলে দেওয়া, পেছনে যে বা যাঁরা বা যাঁদের ষড়যন্ত্রই থাকুক না কেন, উত্তরবঙ্গ সংবাদ শুরুতেই এই দু'জনকে রিপোর্টার হিসেবে পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। পরবর্তীতে তপন রায়প্রধানকেও রিপোর্টার হিসেবে না নিয়ে সাব এডিটর হিসাবে চাকরিতে নেওয়াটা যে কী বড় ধরনের ভুল ছিল, তা উত্তরবঙ্গ সংবাদ কাগজে কাজ করতে করতেই দেখিয়ে দিয়েছিল তপন। কোচবিহারের নার্স বর্ণালী হত্যাকাণ্ড নিয়ে 'পরিবর্তন' কাগজে এমন কভার স্টোরি করেছিল যা উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টোরিকে সব দিক থেকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে দূরদর্শনে চাকরি পেয়ে তপন রায়প্রধান প্রমাণ করে ছেড়েছিলেন যে তিনি অন্য ধরনের প্রতিভা। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে, সবার ভাগ্য তপন রায়প্রধানের মতো হয় না। যেমন রাম সিংহাসন মাহাতোর হয়নি। আমার পরিষ্কার মনে আছে, তপন রায়প্রধান এবং রাম সিংহাসন মাহাতো দু'জনেরই চাকরির প্রস্তাবক ছিলাম আমি। তখন থেকেই বা তারও আগে থেকে সুহাসচন্দ্র তালুকদারের ওপর আমার একটা আব্দার করার মতো জায়গা ছিল। কিন্তু সুহাসচন্দ্র তালুকদারকে কিছুতেই বোঝাতে পারিনি যে এই দু'জন ছেলের মধ্যে কী পরিমাণ সম্পদ আছে। আর সত্যি বলতে কী, শুরুর দিকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ শুধু কলকাতার জন্য রিপোর্টার, দিল্লির জন্য রিপোর্টার বুঝত, উত্তরবঙ্গের বিশাল এলাকা জুড়ে যে কত রিপোর্টার দরকার হতে পারে, সে আন্দাজ আমার যেমন ছিল না, তেমনই অনেকেরই ছিল না। সম্পাদকেরও না।

৪

ম্যাক উইলিয়াম স্কুল। আলিপুরদুয়ার কোর্ট ডাকঘর এলাকার এই স্কুলটিতে দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা আমার। যেবার এই স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভরতি হই, সেবার প্রথম শ্রেণিতে ভরতি করানোর জন্য আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন বাবা। প্রথম শ্রেণিতে ভরতির জন্য পড়াশোনার যে মাপজোক যাচাই চলছিল, সে সব সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়ার পর আমি বাবার কাছে আব্দার করেছিলাম, দ্বিতীয় শ্রেণিতেই ভরতি হব। বাবাকে যুক্তি দিয়েছিলাম, তুমি এবং মা যেভাবে আমাকে বাড়িতে পড়িয়েছ তাতে ক্লাস ওয়ানে পড়ার মতো কিছু বাকি নেই। জেদ চেপে ধরলে

বর্তমান উত্তরবঙ্গ সংবাদ সম্পাদক সব্যসাচী তালুকদার (একদম ডান দিকে) ও অ্যাডভার্টাইজ ম্যানেজার কল্যাণ দাসের সঙ্গে তুষার। ছবি: দেবমিতা সরকার।

> একটা দৈনিক সংবাদপত্র হবে উত্তরবঙ্গের বুকে। বাংলা দৈনিক। সেই সংবাদপত্রের প্রথম 'স্টাফ রিপোর্টার' হব আমি, এত একেবারেই যেন নির্ধারিত ছিল। কিন্তু শেষমেশ আমার রিপোর্টার হওয়া আর হল না। যে কাগজকে উত্তরবঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে প্রতিষ্ঠা দিতে যাবতীয় হ্যাংলাপনায় নিজেকে নিংড়ে চলেছিলাম, যে কাগজ ভূমিষ্ঠ হওয়ার এক বছরেরও বেশি সময় আগে থেকে নিজেকে উত্তরবঙ্গের বুকে তার একমাত্র প্রতিনিধি সাব্যস্ত করেছিলাম, সেই কাগজ শেষ পর্যন্ত আমাকে 'রিপোর্টার'-এর চাকরি দিল না!

স্কুলের প্রধান শিক্ষক গোবিন্দ ভৌমিক এবং সহকারী শিক্ষক গোবিন্দ ব্যানার্জি আমাকে আবার আলাদা করে ইন্টারভিউ নেন। এবং ক্লাস টু-তেই ভরতি করেন।

স্কুলে যখন যাতায়াত শুরু করি, একের পর এক ক্লাস করে চলার মধ্যে ব্যাপক আনন্দ অনুভব করতে থাকি। স্কুলে দেরিতে যাওয়া বা প্রেয়ার লাইনে না দাঁড়াতে পারাকে খুব অপরাধ ভাবতাম। কোনও দিন স্কুলে না যাওয়ার কথা বা স্কুলের মাঝপথে ক্লাস ছেড়ে পালানো— এরকম ভাবতেই পারতাম না। প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্বের দু'জন দাগী ছাত্রের কথা আমার খুব মনে আছে, যাদের দু'জনই পরবর্তীতে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, তারা পড়া ফাঁকি দিত, স্কুল ফাঁকি দিত। আর যখনই প্রধান শিক্ষক গোবিন্দ ভৌমিক সেই দুই ছাত্রকে বাগে পেতেন, গাছের সঙ্গে বেঁধে বা কোনও খুঁটির সঙ্গে বেঁধে এমন পেটাতেন যে সেই দু'জনের রক্তাক্ত পিঠই শুধু দেখা যেত। সেই দুই ছাত্রই মার শুরুর প্রথম দিকে একটু আধটু কাঁদত। কীভাবে যেন দ্রুত ওদের কান্না শুকিয়ে যেত! চলত হেড স্যার গোবিন্দ ভৌমিকের হাতের সেই অমানুষিক প্রহার। কোনও কোনও দিন গোবিন্দ ব্যানার্জি স্যারও পেটাতেন ওদের। সেই ছেলে দুটি অর্থাৎ আমার সেই দুই সহপাঠী জীবনে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারবে, তখন অন্তত ভাবিনি। যদিও এখনও আলিপুরদুয়ারে গেলে ওদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। দেখা হলে কথা বলি। স্কুলের সহপাঠী নামী তবলচি অরুণ গৌতম তথা বুলা এরকম বহু সহপাঠীর খোঁজ রাখে। এই বুলার দৌলতে আমি দারুণ একটা খবর পেয়েছিলাম। খবরটা হল, আলিপুরদুয়ারের ছেলে দেবপ্রসাদ দাস চাকরিসূত্রে অরুণাচল প্রদেশে থাকতেন। বছরে যত সরকারি ছুটি পাওনা ছিল, সেইসব ছুটি নিয়ে উনি কলকাতায় আসতেন। মান্না দে-র কাছে যেতেন। মান্না দে তাঁর জীবনকথা বলতেন, উনি নোট করতেন। দেবপ্রসাদ সেই নোটকে সুসংবদ্ধ রূপে সাজিয়ে দিতেন। দেবপ্রসাদের করা সেই অনুলিখনই পরবর্তীতে মান্না দে-র জীবনী হিসেবে বেরিয়েছে। যে নামেই সম্পাদিত হয়ে থাকুক না কেন, তা সেই দেবপ্রসাদ দাসের ত্যাগ ও তিতিক্ষার ফসল। আমি বুলা গৌতমের মাধ্যমে দেবপ্রসাদের সঙ্গে মান্না দে-র সম্পর্কের অবনতির কাহিনিটুকুও জানি। সে কথা পরে লিখব।

আমার স্কুলে পড়ার সময় পর্বে ম্যাক উইলিয়াম হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়। তবে বেশিদিন নয়, বড় জোর বছর দুই তিনেক ওঁকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম। প্রায় ছ' ফুট লম্বা চশমা পরা মানুষটা মাঝে মাঝেই হাফ প্যান্ট পরে মাথায় টুপি চড়িয়ে ঘুরে বেড়াতেন। সাহেবি কেতাদুরস্ত হেড

স্যার। মায়ের কাছে জেনেছি, নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় অমুক রাস্তা দিয়ে আসছেন শুনলে পুরো রাস্তার মানুষ সম্ভ্রম প্রদর্শন করতেন তাঁকে। নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় তখন কলেজেও তদারকির কাজ চালাতেন। একই সঙ্গে ম্যাক উইলিয়াম স্কুল এবং আলিপুরদুয়ার কলেজ, দুটোর দেখভাল করা নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো রাশভারী মানুষের পক্ষেই সম্ভব ছিল। শহরে তাঁর মতো আর কেউ ছিলেন বলে জানি না। নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় স্কুলের চাকরি থেকে অবসর নিলেও ওঁর সঙ্গে আমার বহু বছর যোগাযোগ ছিল। সেটা মূলত ওঁর ছোট ছেলে টাটু-র জন্য। টাটুর ভাল নাম দেবকুমার মুখোপাধ্যায়। ম্যাক উইলিয়ামে সে আমার সহপাঠী ছিল। এখন সে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ভাল ক্রিকেট খেলত টাটু। আমিও ক্রিকেট খুব ভালবাসতাম। দমনপুরের নর্থ পয়েন্টের কাছে টাটুদের বাড়িটা আলিপুরদুয়ার জংশনের যে দিকটায়, সে দিকটায় একসময় বাঘেরাও ঘোরাফেরা করত। নর্থ পয়েন্টে টাটুদের সঙ্গে বহুবার ক্রিকেট খেলতে গেছি। একবার ওর দাদার উদ্যোগে আয়োজিত দশ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায়ও অংশ নিয়েছিলাম টাটু, আমি দু'জনেই। সহপাঠী হওয়ার পাশাপাশি সহ খেলোয়াড় হওয়ায় টাটুর বাড়িতে আমার যাতায়াত ছিল খুউব। টাটুও আমাদের বাড়িতে আসত। টাটুর বাড়িতে গেলে বহু সময় এমন হয়েছে, টাটুর লাল টুকটুকে ফর্সা মা আমাকেও টাটুর সঙ্গে জোর করে খাইয়ে ছেড়েছেন। ওর বাবা নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়কে টাটু এবং আমি দু'জনেই ব্যাপক সমীহ করে চলতাম। যতদিন ম্যাক উইলিয়াম হাই স্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়েছি, তখন কেন জানি না কলেজে পা দেওয়া, ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া এসব নিয়ে মগজে সেরকম কোনও আগ্রহই খেলা করত না। ম্যাক উইলিয়াম হাই স্কুলকেই কেন জানি না বিশ্ববিদ্যালয় মনে হত।

নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়ের বিদায়ের পর স্থায়ীভাবে প্রধান শিক্ষক পদে পেয়েছিলাম সমীর চক্রবর্তীকে।

"সমীর চক্রবর্তী আমাকে অতিরিক্ত খাতির করতেন। কারণ ক্লাস এইটে পড়তে পড়তে বা তারও আগে আমি 'দোলনা', 'কিশোর ইঙ্গিত' এইসব নামের বেশ কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা করে বের করে ফেলেছিলাম। আর একাদশে পৌঁছতে পৌঁছতে আমার দুটো কী তিনটে কবিতার বই (পুস্তিকা) বেরিয়ে গিয়েছিল বলে। সমীর চক্রবর্তী মাঝে মধ্যেই পত্রিকা বের করতেন। পত্রিকা বের করার পর দেখতেন ওই পত্রিকায় যাঁদের লেখা ছাপা হয়েছে, সেই সব লেখক তথা প্রাজ্ঞ জনদের সঙ্গে আমার দারুণ সম্পর্ক।"

বাংলায় ডক্টরেট করা এই হেড স্যারের পুরো নাম ছিল ড. সমীরেন্দ্র প্রসাদ চক্রবর্তী। এই সমীরেন্দ্র প্রসাদ স্যারও ব্যাপক রাগী ছিলেন। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রায় তাঁর উচ্চতার সমান লম্বা একটা বেত নিয়ে গোটা স্কুল চত্বর চক্কর দিতেন তিনি। পড়াশোনার প্রতি যত্নবান ছিলাম বলেই হয়ত সমীর চক্রবর্তী আমায় খুব ভালবাসতেন। ম্যাক উইলিয়াম স্কুল যেখানে রেল লাইনের ধারে, তার ঠিক পেছন দিকটায় রেল লাইনের ওপারে ম্যাক উইলিয়াম হাই স্কুলের একটা হস্টেল মতো ছিল। অর্ধনির্মিত শিক্ষক আবাস। তখন অন্তত সেরকমই ছিল। অবিবাহিত স্যারেরা কেউ কেউ সেখানে থাকতেন। সেই সব স্যারেদের মধ্যে দু'-একজন টিউশানি করতেন ওইসব অর্ধনির্মিত ঘরেই। অন্যদের সঙ্গে আমিও সেখানে যেতাম পড়তে। সমীর চক্রবর্তী সে সময় থাকতেন সেখানে। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন পরে যিনি সমীর চক্রবর্তীর স্ত্রী হলেন সেই পরি বৌদি। পরির মতোই সুন্দরী বলেই হয়ত পরি নাম ছিল তাঁর। আসল নাম সুচেতা চক্রবর্তী। শিক্ষাব্রতী এই মহিলার অপার স্নেহ পেয়েছি একসময়।

সমীর চক্রবর্তী আমাকে অতিরিক্ত খাতির করতেন। কারণ ক্লাস এইটে পড়তে পড়তে বা তারও আগে আমি 'দোলনা', 'কিশোর ইঙ্গিত' এইসব নামের বেশ কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা করে বের করে ফেলেছিলাম। আর একাদশে পৌঁছতে পৌঁছতে আমার দুটো কী তিনটে কবিতার বই (পুস্তিকা) বেরিয়ে গিয়েছিল বলে। সমীর চক্রবর্তী মাঝে মধ্যেই পত্রিকা বের করতেন। পত্রিকা বের করার পর দেখতেন ওই পত্রিকায় যাঁদের লেখা ছাপা হয়েছে, সেই সব লেখক তথা প্রাজ্ঞ জনদের সঙ্গে আমার দারুণ সম্পর্ক। অর্ণব সেন, জগন্নাথ বিশ্বাস, বিমলেন্দু বিষ্ণু, শক্তি ঘোষ, নির্মলেন্দু বিষ্ণু, কমলেশ রাহা রায়, তুষার চট্টোপাধ্যায়, পবিত্রভূষণ সরকার, কিশোর পাইন, পরিমল দে, রণজিৎ দত্ত এঁদের সঙ্গে আমার ভালই সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক অর্ণব সেনের বাড়িতে আমাদের আড্ডা জমত। আমার প্রথম দুটি এবং পরের আরও চারটি কবিতার বই বের করার পেছনে অর্ণবদার ব্যাপক তাগাদা ছিল। পৃথিবীর নানা দেশের সাহিত্য সম্পর্কে দিলদরিয়া মনে বলে যেতেন অর্ণবদা। তিনি একসময় আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবারের পাতায় বহু গল্প লিখেছেন। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়িসহ গোটা উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে পরিচিত নাম অর্ণবদা। দেবেশ রায়, কার্তিক লাহিড়ী, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর চক্রবর্তী— এঁরা সবাই কাছাকাছি সময়ের মানুষ।

এখনও আলিপুরদুয়ারে গেলে অর্ণবদার সঙ্গে পথে

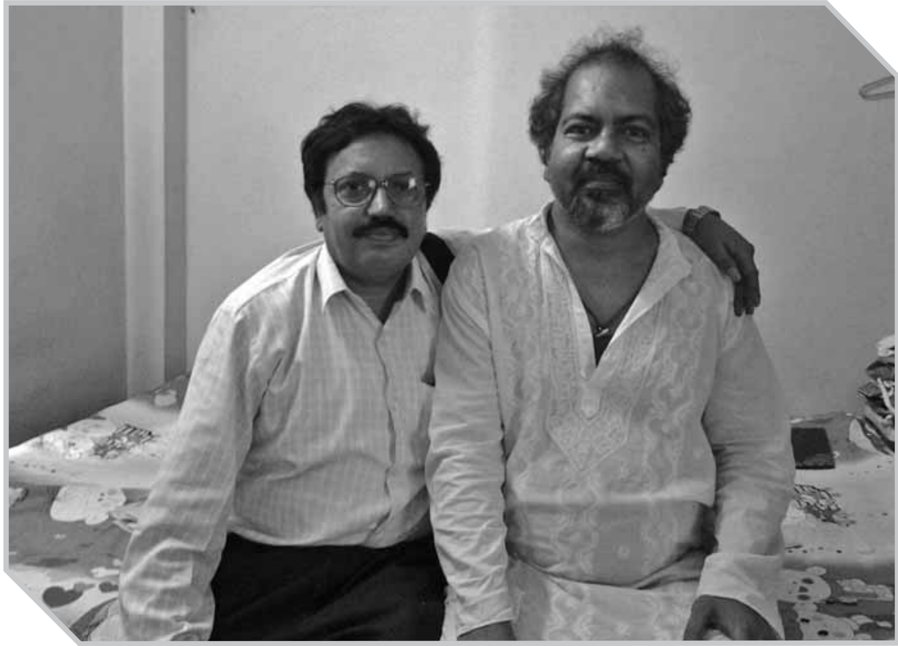

পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ডঃ দেবকুমার মুখার্জি, পাশে পড়ার দিনের সহপাঠী মনোজ রাউত।

কোথাও দেখা হলে কোন দোকানের পরোটা, কোন দোকানের মোগলাই, অমুক মিষ্টি এসব না খাইয়ে ছাড়েন না। আমরা যখন অর্ণবদার বাড়িতে আড্ডা দিতে যেতাম, তখন অর্ণবদার মেয়ে মিমি খুবই ছোট্ট। অর্ণবদা দারুণ সুন্দর করে ওর দুষ্টুমিকে বশে আনতেন।

আবার সমীর চক্রবর্তীর কথায় ফিরি। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার ফর্ম ফিল ইন যেদিন করি, সেদিন সমীর চক্রবর্তী তাঁর প্রধান শিক্ষক কক্ষে ডেকে আমায় আশীর্বাদ করেছিলেন। পাশাপাশি অনুমতি দিয়েছিলেন 'তুমি তোমার প্রিয় প্রধান শিক্ষককে এখন থেকে স্যার না বলে দাদা বলেও ডাকতে পারো।' এই কথা শোনার পর আমার আহ্লাদের পারদ যে কোথায় চড়েছিল জানি না, তবে প্রধান শিক্ষকের কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসার মুখে তাঁকে প্রণাম করে 'সমীরদা আজ আসছি' বলে প্রায় ছুটেই বেরিয়ে এসেছিলাম। তারপর স্কুল লাগোয়া হেড স্যারের আবাসে বহুবার গিয়েছি। যখন কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে চক্কর কাটতাম, তখনও প্রধান শিক্ষক সমীরদার বাড়িতে শুধু যাইনি, থেকেওছি। একজন ছাত্র তার হেড স্যারকে দাদা ভাবছে, সেই দাদার সঙ্গে ঘরোয়া আড্ডা চলছে... এরকম কত স্মৃতি যে হেড স্যারকে নিয়ে আছে। বেশ কয়েকবার এমন হয়েছে, আলিপুরদুয়ারে গেলে আড্ডা দিতে দিতে স্যারের বাড়িতেই রাত কাটিয়ে দিয়েছি। চা-বাগিচা শ্রমিকদের ভাষা-বিভাষা নিয়ে স্যার ঘন্টার পর ঘন্টা বলে গেছেন, আমি তাঁর নিরীহ শ্রোতা। স্যার সাদরি ভাষায় কথা বলতেন। একসময় স্যারকে চা-শ্রমিক মিছিলের পুরোভাগে দেখেছি বহুবার। স্যার যখন মিছিল নিয়ে আসতেন, স্লোগান তুলতেন, তখন কিন্তু আমার ওই স্যারকে লেনিন বলে ভাবতাম। লেনিন মানতাম। স্যারের ছেলে ঘুটিশ, মেয়ে শেলী এদের হাত ধরে খেলেছি। ঘুটিশ ওরফে ড. সৌরভ চক্রবর্তী ছেলেবেলায় ব্যাপক ছোটাছুটি করত। ঘুটিশের দাদু অর্থাৎ হেডস্যার সমীর চক্রবর্তীর শ্বশুরমশাই কানাইবল্লভ গোস্বামীও স্কুলে আমাদের টিচার ছিলেন। কানাইবল্লভ স্যারের ছেলে কনোজবল্লভ, যদ্দুর মনে পড়ে আমাদের সহপাঠী ছিল। আমার আরেক সহপাঠীর কথা মনে পড়ে, সে হল প্রদীপ পাল। পরবর্তীতে প্রদীপ পুলিশের সাব ইনস্পেক্টর, ইনস্পেক্টর, বড়বাবু, মেজবাবু এইসব পদ পার করে ডেপুটি পুলিশ সুপার পর্যন্ত হয়েছিল। প্রদীপ যখন শিলিগুড়িতে পোস্টেড ছিল, তখন পুলিশের ঘুষ-টুষ খাওয়ার অভিযোগ নিয়ে 'ডানপথ' কাগজে, আজকাল-এ লিখেছিলাম। তাতে প্রদীপ ধীরে ধীরে অনেকটাই ক্ষুন্ন হয়ে উঠেছিল। একদিন তাই ওঁর বাড়িতে ডেকে আমাকে প্রদীপ বুঝিয়েছিল, একা নয়, ধারাবাহিক অনেকগুলো ধাপের মধ্য দিয়ে পুলিশে ঘুষ বিলি হয়। একা ঘুষ নিয়ে পার পাওয়ার ঘটনা সহসা ঘটে না। এই সেই প্রদীপ, যে ছিল ব্যায়ামবীর এবং যার সঙ্গে স্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিনে দু'বার ২০০০ মিটার দৌড়ে অংশ নিয়েছিলাম। ক্লাস এইট পর্যন্তই প্রদীপ প্রকৃত অর্থে আমার সহপাঠী ছিল, তারপর ও দেবকুমার মুখার্জির মতোই আর্টস সেকশনে চলে গিয়েছিল। আমি ক্লাস এইটের পর সায়েন্স নিলাম।

সমীর চক্রবর্তী যে আমাকে বরাবরই খুব ভালবাসতেন, তার প্রমাণ 'আজকাল' পত্রিকায় কাজ করতে কলকাতায় চলে আসার পরও উনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গিয়েছেন। চিঠি দিতেন নিয়মিত। বই, পত্রপত্রিকা পাঠাতেন। কলকাতায় পা রাখলে অন্তত একবার ওঁর সঙ্গে আমার কলেজ স্ট্রিটের কোথাও দেখা হতই। সমীরদার ভাইঝি তিলোত্তমা মজুমদার তখন লেখালেখির জগতে পা রাখবে বলে মনস্থির করে ফেলেছে। তিলোত্তমার জীবনে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য এর চেয়ে ভাল ভাবনা আর কিইবা হতে পারত। সমীরদার চিঠি নিয়ে তিলোত্তমা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল আর্মাহার্স্ট স্ট্রিটের 'আজকাল' দপ্তরে। তিলোত্তমা-র বেশকিছু লেখা পড়ে আমার মনে হয়েছিল, মেয়েটা লেখালেখির জগতে অনেক দূরেই হয়ত যাবে। ওর জন্য একটা পা রাখার শক্ত জায়গা দরকার, তাহলেই পারবে। আমি 'আজকাল' পত্রিকায় যাঁরা সাহিত্য বিভাগ দেখতেন, তাঁদেরকে ওর লেখাপত্তর পড়তে দিয়ে, সুপারিশ করে করে ক্লান্ত হয়ে গেলেও দেখেছি তিলোত্তমা রণক্লান্ত হয়নি মোটেও। আমি তখন 'আজকাল'-এ চাকরি করা ছাড়াও দমদমের একটি সাপ্তাহিক 'ভোরের কাগজ' সম্পাদনা করতাম। এই সম্পাদনা বিষয়টি ছিল আংশিক সময়ের পূর্ণ ভারবাহী সামান্য মাইনের চাকরি। সেই কাগজে আমি তিলোত্তমার বহু গল্প ছেপেছি সে সময়। তিলোত্তমা কোনও লেখা এনে পেশ করলেই হত, আমি সেই সব লেখা ছাপতে খুব একটা দেরি করতাম না। সে সময় তিলোত্তমা আমার সহযোগী হিসেবে 'ভোরের কাগজ' পত্রিকায় কিছুদিন কাজও করেছিল। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে তিলোত্তমা নিজের জায়গা খুঁজে পায়। আনন্দ পাবলিশার্সে বইপত্র সম্পাদনার চাকরিতে ব্রতী হয়। বড় বড় সব কাগজগুলি ওকে লেখক স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু 'আজকাল' ততদিনে তিলোত্তমার কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। তবে এরপরও 'উত্তরণ' ক্রোড়পত্রের জন্য 'আজকাল' একবার আমাকে তিলোত্তমার কাছে পাঠিয়েছিল। সে সময় কিছু ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর সঙ্গে সঙ্গে লিখিতভাবে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছিল তিলোত্তমা। ওইভাবেই একবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' পত্রিকার জন্যও লেখা নিয়ে এসেছিলাম।

অন্যদিকে অনেকেরই এটা জানা নেই, নকশালি-হুল্লোড়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র প্রীতীশ নন্দীর পড়াশোনা লাটে উঠে গিয়েছিল। যদিও পরবর্তী জীবনে প্রীতীশ সুপ্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক। সে সময় প্রীতীশ নিজে নকশাল হননি ঠিকই, কিন্তু বাধ্য হয়েছিলেন পড়াশোনা ছেড়ে দিতে। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের এক অভিজাত চা রেস্তোরাঁয় বাবুর্চির কাজ করতেন। প্রেসিডেন্সির পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে ইংরেজিতে লেখালেখির শুরু করেছিলেন। ইংরেজিতে কবিতা লিখে মাত্র ২৬ বছর বয়সেই পদ্মশ্রী। এই পদ্মশ্রী প্রাপ্তিতে প্রীতীশের মনে হয়েছিল, পড়াশোনা ছাড়ার অপরাধের জন্য মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার রাস্তা তিনি খুঁজে পেয়েছেন।

ছবি: লেখকের সংগ্রহ থেকে

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

“সমীরদার ভাইঝি তিলোত্তমা মজুমদার তখন লেখালেখির জগতে পা রাখবে বলে মনস্থির করে ফেলেছে। তিলোত্তমার জীবনে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য এর চেয়ে ভাল ভাবনা আর কিইবা হতে পারত। সমীরদার চিঠি নিয়ে তিলোত্তমা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল আর্মাহার্স্ট স্ট্রিটের 'আজকাল' দপ্তরে। তিলোত্তমা-র বেশকিছু লেখা পড়ে আমার মনে হয়েছিল, মেয়েটা লেখালেখির জগতে অনেক দূরেই হয়ত যাবে। ওর জন্য একটা পা রাখার শক্ত জায়গা দরকার, তাহলেই পারবে। আমি 'আজকাল' পত্রিকায় যাঁরা সাহিত্য বিভাগ দেখতেন, তাঁদেরকে ওর লেখাপত্তর পড়তে দিয়ে, সুপারিশ করে করে ক্লান্ত হয়ে গেলেও দেখেছি তিলোত্তমা রণক্লান্ত হয়নি মোটেও।”

পুরাতাত্ত্বিক ও প্রকৃতি পর্যটনের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র

গোসানীমারি

কোচবিহারের কড়চা

দেবব্রত চাকী

প্রতিবেশি পি এন পি সি

ভারী শিল্প দূরস্ত। কৃষিজাত শিল্প আজ স্বপ্ন। অথচ প্রয়োজন কর্মসংস্থান। প্রশ্ন উঠছে পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটলেও কর্মসংস্থান কোথায়? এই পর্বেই প্রান্তীয় বঙ্গের এই তিস্তা-তোর্সা বঙ্গ কিংবা হিমালয় বঙ্গে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে পর্যটন শিল্প। এবং এই পর্যটন শিল্পকে কেন্দ্র করেই অন্বেষণ করতে হবে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাকে। প্রশ্ন হল সেই পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটবে কী ভাবে? যথেষ্ট উপাদান থাকা সত্ত্বেও যদি তার সদ্ব্যবহার না হয় তবে পর্যটন বিকাশের নামে শুধু শুধু প্রত্যাশা-প্রলাপ বকার-ই নামান্তর। এক্ষেত্রে দরকার বাস্তবসম্মত ভাবনা ও পরিকল্পনা। সব শেষে তার রূপায়ণ। সঠিক পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে উত্তর প্রান্তীয় বঙ্গের পর্যটকদের আকর্ষণ করার মতো উপাদান সমূহকে যদি সুচারুভাবে বাজারজাত করা যায় তবে পর্যটনকে কেন্দ্র করেই এই ভূ-ভাগ ভ্রমণপিপাসুদের গন্তব্য হয়ে উঠতে পারে। আর এর মধ্যে দিয়েই সৃষ্টি হতে পারে প্রচুর কর্ম সংস্থানের।

যেমন ধরা যাক কোচবিহার জেলার গোসানীমারি। ইতিহাস প্রসিদ্ধ একটি স্থাননাম। সুদূর অতীতে এখান থেকে প্রাচীন কামরূপ বা পশ্চিম কামরূপ কিংবা কামতা রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালিত হত। এখানকার রাজপাট ঢিপি আজও সাক্ষ্য বহন করছে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ সংস্থার অধীনস্ত এটি একটি পুরাক্ষেত্র বিশেষ। দীর্ঘদিন এখানে খননকার্য চালিয়েছিল এএসআই বা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ)। খননের মধ্যে দিয়ে প্রাপ্ত সামগ্রী পরীক্ষা করে তা পাল ও সেন যুগের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছে এএসআই। এমনিতে আমরা জানি সেন বংশীয় রাজা নীলধ্বজ, চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর গোসানীমারি বা কামতাপুরকে কেন্দ্র করে কামতা রাজ্য শাসন করেছিলেন। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে গৌড়ের নবাব হুশেন শাহ কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে সেন বংশের শেষ রাজা নীলাম্বরকে পরাজিত ও বন্দি করে রাজ্যের দখল নেন। যদিও কামতা রাজ্যে পাঠান শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। গোয়ালপাড়ার খুন্তাঘাট পরগণার চিকনা পাহাড়ে আত্মগোপন বা পরিচয় গোপন রেখে বসবাসরত ক্ষত্রিয় বংশজাত হারিয়া মন্ডলের পুত্র বিশুর উত্থান ও পরাক্রমে পাঠান আধিপত্য খর্ব হয়। বিশু এই এলাকার কর্তৃত্ব নিজহাতে নিয়ে বিশ্বসিংহ নাম ধারণ করে এক হিন্দু সাম্রাজ্যের সূচনা করেন। পরবর্তীতে তাঁর পুত্র মল্লধ্বজ নরনারায়ণ নাম ধারণ করে রাজ্যকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করান। কথিত এই নারায়ণ রাজবংশের রাজত্ব বেশ কিছুকাল গোসানীমারি থেকেই পরিচালিত হয়। ইতিহাস বলে পাল রাজাদের সামন্ত বৈদ্যদেবের হাত ধরে কামরূপ বা পশ্চিম কামরূপ এক শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তার বংশধর মহারাজ পৃথ্যুর পরাক্রমের কাছেই বিধ্বস্থ হয়েছিলেন বাংলা দখলকারী মুসলমান সমরনায়ক ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী ত্রোয়োদশ শতকের সূচনালগ্নে। এই শতকের দ্বিতীয়ভাগে মহারাজ পৃথ্যুর পুত্র সন্ধ্যা রায়ের হাত ধরেই নগর সভ্যতার বিচ্ছুরণ ঘটে গোসানীমারিতে। কালক্রমে রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে গোসানীমারি। যদিও ইতিহাসের অন্য একটি মত বলে ভগদত্ত বংশীয় ক্ষত্রিয়জাত ‘বর্মণ’ উপাধিধারী রাজবংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ভাস্কর বর্মাও নাকি গোসানীমারি থেকেই কামরূপ সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। এই ক্ষত্রিয়জাত ‘বর্মণ রাজবংশের শাসনকাল তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্মণ রাজবংশের পূর্বে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়কালে গোসানীমারির অবয়ব কী ছিল— তা গবেষণালব্ধ একটি বিষয়। অনুসন্ধানে উঠে আসতে পারে অনেক নতুন নতুন তথ্য।

উপরোক্ত অধ্যায়টি যদি হয় গোসানীমারির একটি দিক তবে অপরটি নিঃসন্দেহে পুরাণে বর্ণিত ভগদত্তর কবচ কাহিনি ও কবচ রূপী মা চণ্ডী বা দেবী গোসানী আরাধনার অধ্যায়টি। কথিত নরকাসুরের পুত্র ভগদত্ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরব পক্ষ অবলম্বন করে যজ্ঞে অবতীর্ণ হলে অর্জুনের হাতে নিহত হন। ভগদত্ত শক্তি

রাজপাট ঢিপি

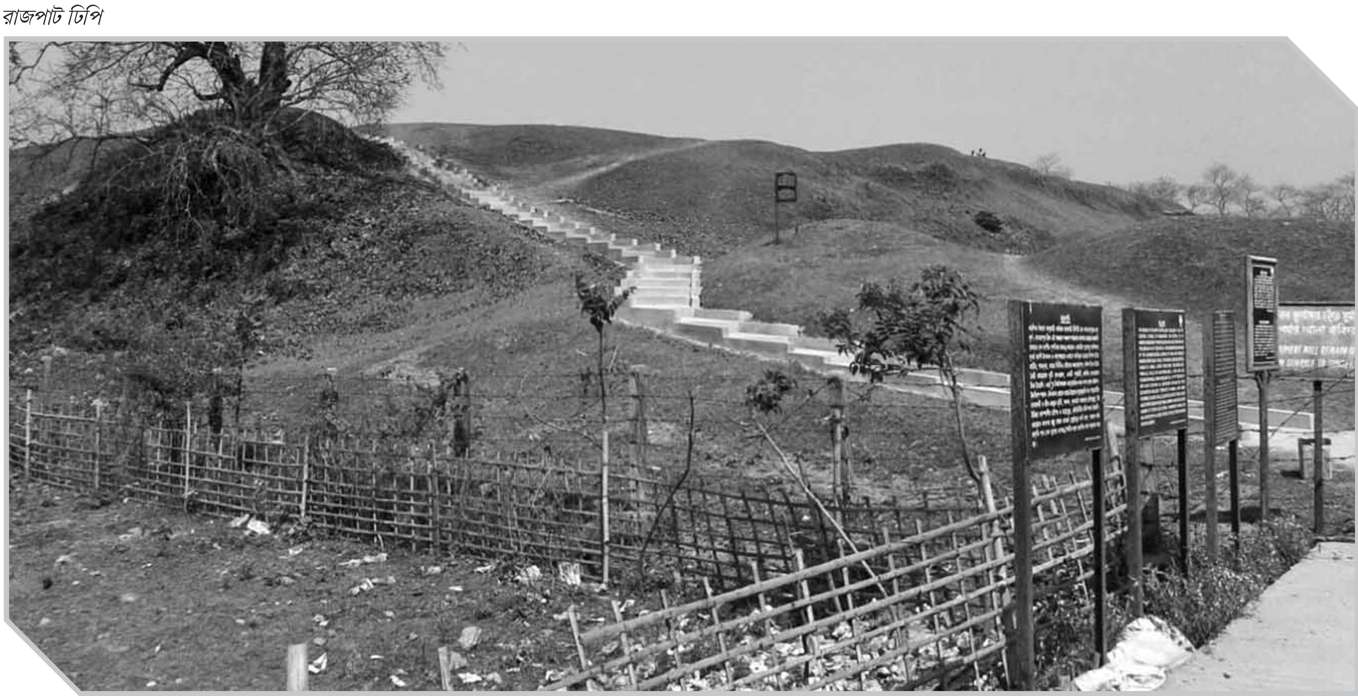

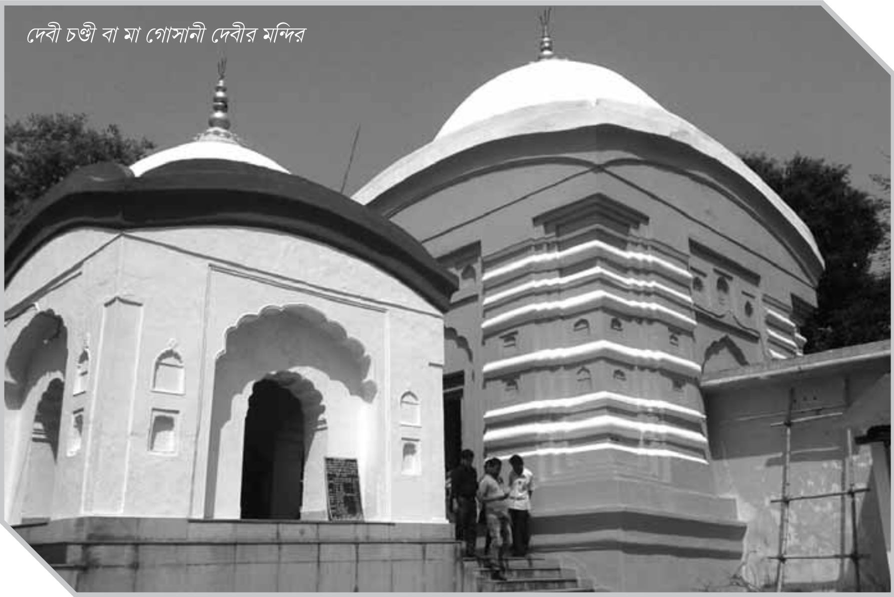

দেবী চণ্ডী বা মা গোসানী দেবীর মন্দির

উপাসক ছিলেন। তাঁর বাহুস্থিত কবচ কুন্ডল মহাশক্তি দেবী চণ্ডী বা মা গোসানী রূপে এখানে পূজিত হয়। লোকশ্রুতি যুদ্ধে ভগদত্ত নিহত হলে তাঁর কবচসহ বাহু খণ্ডটি কুরুক্ষেত্রে পতিত হলে একটি বাজপাখি সেই বাহু খণ্ডটি নিয়ে উড়ে যাবার সময় এই অঞ্চলে তা পতিত হয়। স্ফটিক কুড়ার পাশে এক শিমুল গাছের নীচে কবচ কুন্ডলটি অবস্থান করছে তা জনৈক মধুজালি মারফৎ এই এলাকার রাজার কানে যায়। এরপর রাজা তা উদ্ধার করে নিত্যপুজার ব্যবস্থা করেন। সেই থেকে কবচরূপী দেবী গোসানী বা চণ্ডী আরাধনা চলছে। কোচবিহারের নারায়ণ বংশীয় মহারাজা প্রাণনারায়ণ বর্তমান মন্দির পুনর্নির্মাণ করেন। ভক্তপ্রাণ মানুষের কাছে দেবী গোসানী জাগ্রত দেবী হিসাবে পরিচিত। শরৎকালে দেবী বন্দনার সময় মহাষ্টমী তিথিতে এখানে মহিষ বলি হয়। বিশেষ বিশেষ তিথিতে ভক্তের ঢল নামে। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত বর্তমান মন্দিরটি একটি পুরাতাত্ত্বিক দ্রষ্টব্য হিসাবেও পরিচিত। এর স্থাপত্যকর্ম দেখবার মতো। এই মন্দির কামতেশ্বরী মন্দির নামে খ্যাত।

শুধুমাত্র রাজপাট ঢিপি ও মন্দির নয়, এই রাজনগরকে বেষ্টন করে নির্মিত হয়েছিল সুউচ্চ মৃত্তিকা নির্মিত গড় বা প্রাকার। এই গড়ের স্থানে স্থানে ছিল রাজনগরে প্রবেশের উপযোগী দ্বার বা দুয়ার। মূলতঃ দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে এই দুয়ারগুলির অবস্থান। হোক দুয়ার, শিল দুয়ার, বাঘ দুয়ার, নিমাই দুয়ার, জয় দুয়ার ও সন্ন্যাসী দুয়ার নামাঙ্কিত এই দ্বারগুলির নামকরণের সঠিক ইতিহাস হয়ত বা পর্যটনের নতুন ক্ষেত্রের সন্ধান দিতে পারে। যেমন নিমাই দুয়ার, আমরা জানি মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব নিমাই সন্ন্যাসী নামে সমধিক পরিচিত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় শ্রী চৈতন্যদেব ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে কামরূপে গমন করেন। সেই সময়কালে কোচবিহার রাজপরিবারের স্বনামধন্য নৃপতি মহারাজ নরনারায়ণ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। রাজ্যের রাজধানী গোসানীমারি হয়ে থাকলে হয়ত বা শ্রী চৈতন্যদেব নিমাই দুয়ার দিয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করে মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে থাকলেও থাকতে পারেন এবং এখান থেকেই হয়ত বা মণিকুটে গমন করেন তিনি। সেই সময়কালে পশ্চিমদিক থেকে পূর্বে কামরূপ যাবার এটাই ছিল সহজ পথ। খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লার ভাষায় করতোয়া নদী অতিক্রম করেই শ্রী চৈতন্যদেব কামরূপে আসেন।

যাই হোক উপরোক্ত আলোচনার মধ্যে দিয়ে যে ইতিহাসের সন্ধান আমরা পাচ্ছি এবং গোসানীমারিকে কেন্দ্র করে চর্তুদিকে যে সকল ঐতিহাসিক উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তা কি পর্যটকদের আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়? তারপর পশ্চিমবঙ্গ বনবিভাগের অধীনে গোসানীমারি ফরেস্ট এবং নবনির্মিত সাগরদিঘি সেতু সংলগ্ন এলাকায় সৃষ্টি হওয়া হ্রদকে যদি পর্যটন উপযোগী বিনোদন ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তোলা যায়, ভবিষ্যতে গোসানীমারিকে কেন্দ্র করেই একটি পর্যটন হাব গড়ে ওঠা অসম্ভব কিছু নয়। এর সঙ্গে পাশ্ববর্তী এলাকার দ্রষ্টব্যগুলিকে নিয়ে পর্যটন শৃঙ্খল গড়ে তুলতে পারলে গোসানীমারি হয়ত একদিন হয়ে উঠবে ভ্রমণপিপাসু মানুষজনের নিশ্চিত গন্তব্য। তবে তার আগে প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা, সঠিক তথ্যায়ণ ও সঠিক উপস্থাপনা। সেই সঙ্গে জরুরি নির্ভেজাল আন্তরিকতার মেলবন্ধন। সমস্ত সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে 'জনগণমন অধিনায়ক'-রা বিষয়টির দিকে একটু চোখ খুলে তাকাবেন কি?

'পশ্চিমবঙ্গ বনবিভাগের অধীনে গোসানীমারি ফরেস্ট এবং নবনির্মিত সাগরদিঘি সেতু সংলগ্ন এলাকায় সৃষ্টি হওয়া হ্রদকে যদি পর্যটন উপযোগী বিনোদন ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তোলা যায়, ভবিষ্যতে গোসানীমারিকে কেন্দ্র করেই একটি পর্যটন হাব গড়ে ওঠা অসম্ভব কিছু নয়। এর সঙ্গে পাশ্ববর্তী এলাকার দ্রষ্টব্যগুলিকে নিয়ে পর্যটন শৃঙ্খল গড়ে তুলতে পারলে গোসানীমারি হয়ত একদিন হয়ে উঠবে ভ্রমণপিপাসু মানুষজনের নিশ্চিত গন্তব্য।'

পাহাড় পর্ব

মকাইবাড়ি আজও 'রাজা'ই

একটু ফাঁক পেলেই এদিক ওদিক বেরিয়ে পড়ার স্বভাব আছে আমার। মনের ব্যাটারি রিচার্জ করার জন্য বেড়ানোর মতো জিনিস আছে বলে মনে হয় না। সম্প্রতি চালসা, মেটেলি, নাগরাকাটা, মালবাজারের মতো জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন চা-মহল্লায় ঢুঁ মেরেছি। ভেবেছিলাম সেখানে রাজনৈতিক উত্তাপ দেখতে পাব। কিন্তু অবাক হয়েছি দেখে, রাজনীতির রং ভুলে মোরগ লড়াই নিয়ে মেতে আছেন এদিকের আদিবাসী মানুষজন। মোরগ লড়াই যাঁরা কখনও দেখেননি তাঁরা অনুমানও করতে পারবেন না ঠিক কতটা উত্তেজক হতে পারে এই খেলা।

সেদিন পড়ন্ত দুপুরে নাগরাকাটার এক চা-মহল্লায় সেদিন গিয়ে দেখি সে এক কান্ড! পরপর হাঁড়িতে সাজানো হাঁড়িয়া। ঘরোয়া নেশার মৌতাতে মজে আছেন অনেকে। বাতাসে ভেসে আসছে হাঁড়িয়ার ঘ্রাণ। অজস্র লোকের মাথা দেখা যাচ্ছে। গোল হয়ে

প্রতিবেশি
পি এনপিসি

তাঁরা মেতে রয়েছেন মোরগ লড়াইয়ে। যুযুধান দুই মোরগের লড়াইয়ের আখড়া থেকে ঝটরপটর করে শব্দ আসছে। বৈশাখি বাতাসে এলোমেলো উড়ে বেড়াচ্ছে ধুলো, প্লাস্টিক আর মোরগের রঙিন পালক। এই আখড়ার একদিকে রাজনৈতিক দলের পতাকা উড়ছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই কারও। বরং বেশি উত্তেজনা কার মোরগ জিতবে আর কার মোরগ হারবে সেটা নিয়ে। বাজিও ধরা চলছে ধুন্ধুমার। ভিড়ের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞেস করে জানলাম তাঁদের কৃষ্টি আর সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে মোরগ লড়াই। বাগানে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা চালু হলেও এই ঐতিহ্যবাহী ধারাকে ধরে রেখেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই জমজমাট মোরগ লড়াইয়ে উৎসাহ দেন বাগান কর্তৃপক্ষও। কেন না ভোট তো দু'দিনের ব্যাপার কিন্তু মোরগ লড়াই তো হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর পরাজয় স্বীকার করে নিল একটি মোরগ। জয়ী মোরগটিকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠল গোটা এলাকা। যাঁরা বাজি

মকাইবাড়ি চা বাগানে রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

জিতেছেন তাঁদের মুখে হাজার ওয়াটের আলো। যাঁরা হেরেছেন তাঁরাও যে ভীষণ রকম ভেঙে পড়েছেন এমনটা মনে হল না।

ডুয়ার্সকে একা টেনে লাভ নেই, কারণ গোটা দুনিয়া জুড়েই তো চলছে মোরগ লড়াই। ক্ষমতা দখলের মোরগ লড়াই। মজার ব্যাপার হল, ময়দানে যারা সম্মুখ সমরে প্রাণ দেয় বা নেয়, তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় অস্ত্র। আর লড়াইয়ে পেছনে থাকেন আসল কুশিলবরা। এমন মোরগ লড়াই চলে চা বাগানগুলির ভেতরে বাইরেও। কিন্তু সেসবের উর্দ্ধে গিয়ে ফের নজির সৃষ্টি করেছে দুনিয়ার সেরা চায়ের আঁতুরভূমি, উত্তরের অহংকার মকাইবাড়ি চা বাগান। খবরের কাগজের পাতায় নির্বাচন সংক্রান্ত সংবাদ পড়তে পড়তেই চোখে পড়ে গেল ছোট্ট একটা খবর। কর্মীদের হাতেই মালিকানার ভার অর্পণ করছেন মকাইবাড়ির 'রাজা'। পলকে মন স্মৃতির উজান বেয়ে ছুটল। নব্বই দশকের শুরু থেকে শেষ অবধি নিয়মিত দার্জিলিং যাতায়াত করতাম। তখন আমাদের বন্ধুবান্ধবদের গ্রুপটার সকলেই নির্ভেজাল ব্যাচেলর। তাদের মধ্যে দু'-চারজন চাকরি পেয়ে গিয়েছিল জীবনবীমা সংস্থায়। কারও পোস্টিং ছিল দার্জিলিঙে, কারও আবার গ্যাংটকে। দার্জিলিং অফিসে যাদের প্লেসমেন্ট করা হয়েছিল তারা থাকত বড়া কাকঝোরার কাছে একটা মেসে। দার্জিলিং ঢুকতেই আভা আর্ট গ্যালারি পড়ে, তার ঠিক নিচে। সে সময় আমরা প্রত্যেক মাসে একবার নিয়ম করে যেতাম দার্জিলিং। শুক্রবার বিকেলে গিয়ে দু'দিন বন্ধুদের সঙ্গে কাটিয়ে সোমবার ভোরবেলা রওনা দিয়ে ফিরে আসতাম জলপাইগুড়িতে। দার্জিলিং যাবার সময় তখন তিনধারিয়া দিয়ে গাড়ি যেত। ফিরত পাঙ্খাবাড়ি দিয়ে।

> ডুয়ার্সকে একা টেনে লাভ নেই, কারণ গোটা দুনিয়া জুড়েই তো চলছে মোরগ লড়াই। ক্ষমতা দখলের মোরগ লড়াই। মজার ব্যাপার হল, ময়দানে যারা সম্মুখ সমরে প্রাণ দেয় বা নেয়, তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় অস্ত্র। আর লড়াইয়ে পেছনে থাকেন আসল কুশিলবরা। এমন মোরগ লড়াই চলে চা বাগানগুলির ভেতরে বাইরেও। কিন্তু সেসবের উর্দ্ধে গিয়ে ফের নজির সৃষ্টি করেছে দুনিয়ার সেরা চায়ের আঁতুরভূমি, উত্তরের অহংকার মকাইবাড়ি চা বাগান।

দার্জিলিং থেকে ফেরার সময় কার্শিয়াংয়ের অমরজিৎ-এ ঢোকা হত। সেই অমরজিৎ হোটেল ও রেস্তোরাঁর ব্যালকনি থেকে গোটা পাহাড়ি উপত্যকাটার চমৎকার ভিউ পাওয়া যায়। ব্রেকফাস্ট করতে করতে আমরা তাকিয়ে থাকতাম সবুজ কার্পেটের মতো বিছিয়ে থাকা মকাইবাড়ি চা-বাগানটার দিকে। দেড়শো বছরের পুরনো বাগান বলে কথা। কত যে বর্ণময় ইতিহাস ঘিরে রেখেছে বাগানটাকে কে জানে। কার্শিয়াং শহর ছাড়িয়ে পাঙ্খাবাড়ির পথ দিয়ে ফেরার সময় মকাইবাড়ি চা-বাগান পড়ত পথের ধারে। দেখা যেত ফ্যাক্টরির সবুজ রঙা চাল, ম্যানেজারের বাংলো, স্টাফ কোয়ার্টার। ২০১৬ সালের মার্চ মাসে মকাইবাড়ি চা-বাগানের মধ্যে থাকা ঐতিহ্যশালী হেরিটেজ বাংলোটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সেই সঙ্গে পুড়ে যায় বহু দুষ্প্রাপ্য নথি ও ইতিহাস-জড়ানো স্মারক।

খবরের ভেতরে ঢোকা গেল এবার। জানা গেল, ঐতিহাসিক ও বিখ্যাত মকাইবাড়ি চা-বাগানের মালিকানা ছাড়ার সিদ্ধান্তটা আগেই নিয়েছিলেন রাজা বন্দোপাধ্যায়। কিন্তু সেই মালিকানার অংশ যে নিজের দীর্ঘদিনের কর্মীদের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন তা কেউই আগে থেকে আঁচ করতে পারেননি। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তটাই নিয়ে সকলকে চমকে দিলেন রাজা। যাঁর পোশাকি নাম স্বরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগেই বয়সের কারণে দেখভাল সম্ভব না হওয়ায় ২০১৩ সালে লক্ষ্মী গ্রুপকে মকাইবাড়ি টি এস্টেটের ৮৮ শতাংশ মালিকানা বিক্রি করে দিয়েছিলেন তিনি। নিজের হাতে রেখেছিলেন মাত্র ১২ শতাংশ। কিছুদিন আগেই কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করে তাঁর সিদ্ধান্ত তিনি জানিয়ে দেন। তাঁর নিজের ১২ শতাংশ লভ্যাংশ কর্মীদের ঘরে ঢুকবে এবার থেকে। যদিও তাঁদের জন্য যে এমন মধুর চমক অপেক্ষা করে আছে সে ব্যাপারে কর্মীরা কেউই আগে থেকে কিছুই জানতেন না। শেয়ার হস্তান্তর প্রক্রিয়া খুব সহজ জিনিস নয়। বেশ কিছু আইনি জটিলতা থাকে বলে জানি। তবে একটা কথা ঠিক, রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে চা-বাগানের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ও যুগান্তকারী ঘটনা ঘটবে। তেমনটাই অনুমান করছে পাহাড়-তরাই-ডুয়ার্সের চা-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

উত্তর সম্পাদকীয়

বনমন্ত্রী পদটি কি এখন শুধুই ‘ল্যাম্প পোস্ট’?

লালগড়ের জঙ্গলে মানুষের হাতে মৃত্যু হল বাঘের

সিনেমা তৈরির এক ইস্কুলে নাকি প্রথম দিন ক্লাসে স্যর এসে জিগ্যেস করেন অদ্ভুত প্রশ্ন। ভালো একটা ছবি বানাতে গেলে তো দরকার হয় ভালো অভিনেতা, ভালো সিনেমাটোগ্রাফার, ভালো গল্প, ভালো গান মিউজিক, ভালো টেকনিশিয়ান ইত্যাদি! প্রশ্নটা হল, সবই যদি এক নম্বর হয় তো ছবি এমনিই ভালো হওয়ার কথা, তাহলে আলাদা করে ডিরেক্টরের আবার কী প্রয়োজন? কেবল ‘অ্যাকশন’ আর ‘কাট’ বলবার জন্য? এসময় তেমনিই প্রশ্ন উঠতে পারে, এ রাজ্যে বনমন্ত্রী পদটির কী প্রয়োজন? লালবাতি লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতে আর অনুষ্ঠানে ফিতে কাটতে? নাকি কোনও একটি বিশেষ এলাকার মানুষকে খুশি রাখতে? ইদানীং কালে এরাজ্যের বনমন্ত্রীও কিন্তু সেই রকম প্রশ্নের সম্মুখীন করে দিয়েছেন আমাদের।

যেমন গত ৩১ জানুয়ারি লালগড়ের মাওবাদীদের ছেড়ে যাওয়া জঙ্গলে সন্ধান মিলেছিল একটি আস্ত রয়েল বেঙ্গল বাঘের। যেখানে আজও আদি জনজাতির মানুষেরা পশু শিকার উৎসবে সোল্লাসে যোগ দেন, সেই জঙ্গলে বাঘের পায়ের ছাপ মিলেছিল বোধ হয় শতাব্দী পেরিয়ে। সতর্ক বনকর্তারা ‘বহু চেষ্টা করেছি বাঘটিকে বাঁচাবার’ বলে দোহাই দিলেও তা যে সত্যি নয় তার প্রমাণ মিলল আড়াই মাস ধরে লুকোচুরির পরে। বাংলা নতুন বছর আসবার আগেই বাঘটাকে নিকেশ করে দেওয়া হল, জঙ্গলমহলের মানবকুল মৃত বাঘের সঙ্গে সেলফি তুলে উদ্‌যাপন করল ‘জীবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ’ তকমা, অথচ অপরাধী ধরবার ব্যাপারে সরকারি গা-ছাড়া মনোভাব বেশ চোখে পড়বার মতই।

দিল্লির কেন্দ্রীয় বাঘ সংরক্ষণ কমিটি রীতিমত বিরক্ত রাজ্যের বনদপ্তরের এই অসহায় ভূমিকায়, তাঁরা চান তদন্ত। মুখ্যমন্ত্রীকে পর্যন্ত দিল্লির পশুপ্রেমী খ্যাত জনৈক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে শুনতে হল অসম্মানজনক কথা। রাজ্যে বাঘ সংরক্ষণ নিয়ে আদৌ যে কোনও কাজ হচ্ছে না, কতগুলি অকর্মণ্য অপদার্থ যে স্বেচ্ছাসেবীর ছদ্মবেশে বাঘের দৌলতে করে কম্মে খাচ্ছেন, তা আজ দিনের আলোর মতই পরিষ্কার, খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও। বনদপ্তরকে ‘ঠুঁটো জগন্নাথ’ নাকি ‘নিধিরাম সর্দার’ কোন উপাধিতে ভূষিত করবেন মানুষ ভেবে পাচ্ছে না। কিন্তু এসবের মধ্যেও সবচেয়ে বেশি বিস্ময় হল রাজ্যের বনমন্ত্রীর অবাক করা ভূমিকা। অকুস্থলে যাওয়া তো দূরের ব্যাপার, বনদপ্তরের কর্তাব্যক্তিদের প্রকাশ্যে ঝাড় দেওয়ারও কোনও প্রশ্নই ওঠে না, স্রেফ দুলাইনের বিবৃতিতে সেরে ফেললেন তাঁর দায়িত্ব?

কেউ কেউ বলছেন, নিহত বাঘটির সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হল, সময়টা পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের, এসময় তার এরাজ্যে বেড়াতে না এলেই ভালো হত। ব্যাঘ্র মহারাজ যেটাকে জঙ্গলমহল ভেবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সেটি আসলে মনুষ্য মহল, আর এই

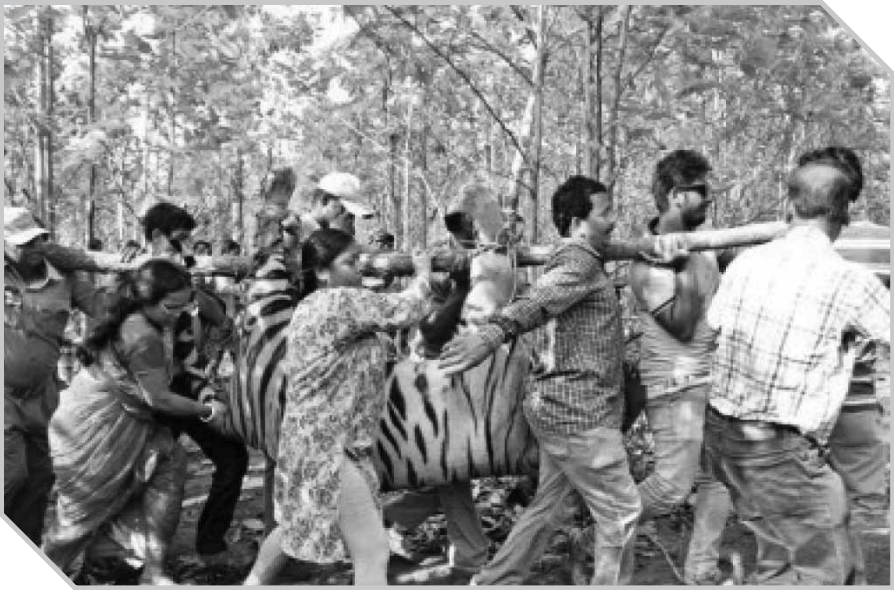

সময়ে এখানে মানুষ নাকি শ্বাপদের রূপ ধারণ করে! একই যুক্তি ধরে অনেকে বলছেন, বনমন্ত্রী আসবেন কী করে? তাঁর চারদিকে যেসব দোপেয়ে জানোয়ারেরা ঘুরে বেড়ায় সম্বৎসর এসময় তাদের সামলানো কি চাট্টিখানি ব্যাপার? তাও আবার দু'-চার দিনের ব্যাপার নয়, লম্বা পাঁচ বছরের হিসেব পাকা করার মতো দুরূহ কাজ। অতএব আচমকা কোত্থেকে এক বাঘ বেড়াতে চলে আসবে, তাঁর জন্য কি আলাদা সময় বের করা সহজ কাজ? বনমন্ত্রী হয়েছেন বলে তো আর জ্যোতিষী নন!

সে যে যাই বলুন, এই বনমন্ত্রীই কি প্রথম সিংহাসনে আহরণ করার পর পরই বলেছিলেন, হাতিদের সংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে হলে তাদের বন্ধ্যাত্বকরণ প্রয়োজন? কিংবা তারপর হাতিদের 'অত্যাচার' বন্ধ করতে তাদের যাযাবর চরিত্রে বদল ঘটাতে চেয়েছিলেন ইনিই? বিদেশের কথা ছাড়ুন, অন্য কোনও রাজ্যের জঙ্গল দেখতে তিনি গিয়েছিলেন কখনো? কিছুদিন আগে 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি অকপটে স্বীকার করেছিলেন, বিধানসভা, প্রতি হপ্তায় ট্রেনে কলকাতা যাতায়াত, ফিরে এসে নিজের গড় রক্ষা ইত্যাদি করতেই দিন চলে যায়, ওসব জঙ্গল-টঙ্গল ঘুরবার সময় কোথায়? জঙ্গল সংরক্ষণ নিয়ে বইটই পড়বার সময় কোথায়? সেজন্যই বোধহয় ইকোটুরিজম নিয়ে প্রশ্ন করাতে তিনি সাফ বলে দিতে পারেন, ওসব পর্যটন দপ্তরের বিষয়, তাঁকে ওর মধ্যে টানাটানি না করাই ভাল?

“বনদপ্তরের কর্তাদের চামড়া না হয় পুলিশের মতই মোটা হয়ে গিয়েছে, হাজার নিন্দেমন্দ গালিগালাজ তাদের কাছে এখন খাওয়ার পাতে চাটনির মতই! কিন্তু এই পরিস্থিতিতে একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘ হত্যা বাংলার পক্ষে কতটা অবমাননাকর সেটা অনুধাবন করবার মানসিকতা নিশ্চয়ই হারিয়ে ফেলেননি বনমন্ত্রী সাহেব? নাকি সব দায় একা মুখ্যমন্ত্রীর?”

কিছু বিদ্বান মানুষ আজকাল বলছেন, ধনমন্ত্রীর মতই বনমন্ত্রীরও ন্যূনতম যোগ্যতা থাকাটা বোধহয় আবশ্যক, কারণ এর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে পরিবেশ, আদি জনজাতির কৃষ্টি সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখবার মতো কঠিন বিষয়, যা দিনের পর দিন কঠিনতর হচ্ছে। বনমন্ত্রীকে এসবের সমন্বয় ঘটাবার লীডারশিপ নিতে হয়, অবতীর্ণ হতে হয় ছবির ডিরেক্টরের ভূমিকায়। সেখানে এরাজ্যের বনমন্ত্রীর রাখঢাক না করে এসব সরল স্বীকারোক্তিই কি প্রমাণ করে না, 'বনমন্ত্রী' পদটিই এখন একটি আলংকারিক পদ হয়ে উঠেছে? তা না হলে রাজ্যের জু অথরিটি, বায়ো ডাইভারসিটি বোর্ড, ইকো টুরিজম বোর্ড, ওয়েস্ট ল্যান্ড উন্নয়ন নিগম, রাজ্য বন উন্নয়ন এজেন্সিতে কর্মকর্তাদের মধ্যে বনমন্ত্রীর স্থান হয় না কেন? এ সবই তো অরণ্যের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত!

রাজ্য বন্যপ্রাণ দপ্তরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, চল্লিশ বছর আগে এ রাজ্যে বাঘের সংখ্যা ছিল ৩০০, যার সিংহভাগ সুন্দরবনের হলেও, উত্তরবঙ্গে বাঘের সংখ্যা ছিল ৫০এর উপরে। ২০০৪ সাল পর্যন্ত সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু তারপরের ছয়-সাত বছরে আরও অনেক কিছুর মতই সে সংখ্যা কমতে কমতে শ'য়ের নীচে চলে গিয়েছে, আর উত্তরে তা কমে হয়েছে সাকুল্যে তিন। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, গত সাত বছরে সেই কমে যাওয়া সংখ্যা কিন্তু আর বাড়েনি। অথচ বনদপ্তরের প্রকাশিত বাজেট থেকেই জানা যায়, বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের খাতে গত দু'বছরে বরাদ্দ ও ব্যয় বেড়েছে অনেকটাই, ৩২.৬ কোটি থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে বার্ষিক ৫৩.৮ কোটি টাকা। এর পর তো বাইরের নানা অনুদান খয়রাতি তো আছেই, সেসব নিয়ে না হয় আরেকদিন গপ্পো করা যাবে! বন্যপ্রাণ বিভাগের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে বনমন্ত্রীর তো এসব তথ্য অজানা থাকবার কথা নয়! বনদপ্তরের কর্তাদের চামড়া না হয় পুলিশের মতই মোটা হয়ে গিয়েছে, হাজার নিন্দেমন্দ গালিগালাজ তাদের কাছে এখন খাওয়ার পাতে চাটনির মতই! কিন্তু এই পরিস্থিতিতে একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘ হত্যা বাংলার পক্ষে কতটা অবমাননাকর সেটা অনুধাবন করবার মানসিকতা নিশ্চয়ই হারিয়ে ফেলেননি বনমন্ত্রী সাহেব? নাকি সব দায় একা মুখ্যমন্ত্রীর? পশুপ্রেমী সেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যিনি এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কড়া কথা শুনিয়েছেন তাঁকেও তো পুরো দোষ দেওয়া যায় না, রাজ্যের বনমন্ত্রী কে তা হয়ত তিনি ঠিক করে চেনেনেই না!

মেদিনীপুর থেকে বদলি হয়ে ডুয়ার্সে আসা এক সরকারি ডাক্তার সেদিন তাঁর শিক্ষক-রুগীকে আক্ষেপ করে বলছিলেন, সত্যিই এই ঘটনায় জেলার লোক হিসেবে তাঁর মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে! রুগী তাঁকে আশ্বস্ত করলেন, একইরকম মাথা নীচু হচ্ছে তাঁরও, কারণ দুষ্কৃতীরা মেদিনীপুরের হলেও 'নীরব থাকা' মন্ত্রীটি যে ডুয়ার্সের!!

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ছবি ইন্টারনেটের সৌজন্যে

উত্তরের পরিবহণ

হলদিবাড়ি চিলাহাটি রেলপথ

অবশেষে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হতে চলেছে হলদিবাড়ি থেকে বাংলাদেশের নীলফামারী জেলার চিলাহাটিতে। ট্রায়ালও হয়ে গেছে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে। উভয় দেশের ১১.৩৪ কিমি রেললাইন পুনরায় স্থাপিত হলে ভারতের হলদিবাড়ি হয়ে নিউজলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির সাথে সরাসরি ট্রেন চলাচল শুরু হবে। এখন ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী এক্সপ্রেস চলাচল করে কলকাতা-গেদে-দর্শনা-হার্ডিঞ্জ ব্রিজ হয়ে ঢাকা। হলদিবাড়ি-চিলাহাটি রেলযোগাযোগ স্থাপিত হলে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ হয়ে ফের অতীতের পথে শিলিগুড়ি আসা যাবে। উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলসহ নেপাল, ভুটানের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটবে। রেলপথ স্থাপিত হলে প্রথম ধাপে চলাচল করবে পণ্যবাহী রেল এবং দ্বিতীয় ধাপে যাত্রীবাহী রেল।

বাংলাদেশের বৃহত্তম নীলফামারীর সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানাটি অসম বেঙ্গল রেলওয়ের উদ্যোগে ১৮৭০ সালে স্থাপন করা হয়েছিল। ওই সময় ভারতের শিলিগুড়ি থেকে ছেড়ে হলদিবাড়ি হয়ে বাংলাদেশের নীলফামারীর চিলাহাটি, সৈয়দপুর এবং দর্শনা দিয়ে দার্জিলিং মেল কলকাতা চলাচল করত। চিলাহাটি থেকে হলদিবাড়ি এবং জলপাইগুড়ি চলাচল করত প্যাসেঞ্জার ট্রেন। পাক-ভারত যুদ্ধের পর ১৯৬৫ সালে চিলাহাটি-হলদিবাড়ি রেলপথটি বন্ধ হয়ে যায়। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান বাংলাদেশের সরকার দায়িত্বে আসার পর নতুন করে রেলরুটটি চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ অংশে প্রায় ৭ কিমি এবং ভারতের হলদিবাড়ি অংশে ৪.৩৪ কিমি রেলপথ পুনরায় স্থাপনের লক্ষ্যে ২০১৬ সালের ৮ মে থেকে সপ্তাহব্যাপী বাংলাদেশ এবং ভারতের অংশের জরিপের কাজ শেষ হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, নীলফামারী পর্যন্ত বর্তমানে খুলনার মংলা, ঢাকা ও রাজশাহী থেকে সরাসরি ব্রডগেজ রেলপথ চালু রয়েছে নীলফামারী-চিলাহাটি স্টেশনের সীমান্ত পর্যন্ত।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আগে চিলাহাটি থেকে হলদিবাড়ি পর্যন্ত রেল যোগাযোগ ছিল। কিন্তু '৬৫ যুদ্ধপরবর্তী সময়ে তা বন্ধ হয়ে যায়। নতুন রেললাইন স্থাপনের মাধ্যমে '৬৫ পূর্ব রেলসংযোগ পুনরায় স্থাপন করার প্রয়াস চলছে। সার্কের সদস্য রাষ্ট্র নেপাল এবং ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্য ও পণ্য পরিবহণ সহজ করতে

> ‘১৯৭১ সালের পর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে চিলাহাটি রেলপথ বন্ধ হয়ে যায়। এই বন্ধ রেলপথ চালু করতে উদ্যোগ নিয়েছে দু' দেশেরই সরকার। এনজেপি থেকে হলদিবাড়ি ৫৭ কিমি রেলপথ রয়েছে। হলদিবাড়ি থেকে চিলাহাটি মাত্র তিন কিলোমিটার রেলপথ পাতলেই রেল যোগাযোগ শুরু হয়ে যাবে দু'দেশের মধ্যে। নতুন লাইন পাতা ছাড়াও হলদিবাড়ি স্টেশনকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেশনে পরিণত করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে।’

৫৭ কিমি রেলপথ রয়েছে। হলদিবাড়ি থেকে চিলাহাটি মাত্র তিন কিলোমিটার রেলপথ পাতলেই রেল যোগাযোগ শুরু হয়ে যাবে দু'দেশের মধ্যে। নতুন লাইন পাতা ছাড়াও হলদিবাড়ি স্টেশনকে আন্তর্জাতিক মানের স্টেশনে পরিণত করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারও হলদিবাড়ি রেলস্টেশন পরিদর্শন করে গেছেন। ট্রায়ালও হয়ে গেল ভারতীয় সীমান্তের রেলপথে।

বাংলাদেশ হাইকমিশন সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে, ভারত হয়ে নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে রেলসংযোগ স্থাপনের জন্য নীলফামারি জেলার চিলাহাটি থেকে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত সাড়ে সাত কিমি রেলপথ নির্মাণ করার কাজ চলছে বিবিআইএন রেল যোগাযোগের অন্যতম ট্রেনরুট হিসাবে। বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ভারতের সীমানা পর্যন্ত সাড়ে চার কিলোমিটার রেলপথ তৈরি করবে বাংলাদেশ সরকার। বাংলাদেশের অংশের জন্য ব্যয়ভার ধার্য করা হয়েছে ৭৮ কোটি ১২ লাখ টাকা। সরকারি অর্থায়নে রেলপথটি চূড়ান্ত করার প্রস্তাব করেছে রেলদপ্তর। পুরনো রেলপথ থাকায় আর নতুন করে জমি অধিগ্রহণ করতে হবে না। তবে ছোট কয়েকটি রেলসেতু এবং কালভার্ট নির্মাণ করতে হবে। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত সংঘর্ষের পর এই রেল পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলসূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় সরকার এখনো পর্যন্ত ৪০ কোটি টাকা এই প্রকল্পের জন্য খরচ করেছে। এনজেপি থেকে হলদিবাড়ি পর্যন্ত ৫৭ কিলোমিটার রেলপথের দু'ধারে কুড়ি হাজারেরও বেশি দখলদার আছে। তাদেরকে উচ্ছেদ করার বিষয়টি রাজ্য সরকারকে জানানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় জমি পেয়ে গেলে মালিগাঁও কনস্ট্রাকশন বিভাগ বাজেটে প্রস্তাবিত সাড়ে তিন কিলোমিটার রেলপথ তৈরি করবে। অদূর ভবিষ্যতে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি হয়ে কোচবিহারের হলদিবাড়ির ওপর দিয়ে বাংলাদেশের চিলাহাটি বা পার্বতীপুর হয়ে শিয়ালদহ তথা কলকাতায় যাওয়া যাবে বলে আশাবাদী হলদিবাড়ি এবং নীলফামারী দুই অঞ্চলেরই আমজনতা।

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে চিলাহাটি-হলদিবাড়ি রেলপথ। বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত এবং নেপালের মধ্যে (বিবিআইএল) রেলসংযোগ স্থাপন নিয়ে আলোচনা চলছে। সম্প্রতি ভারত, নেপাল ও ভুটানের রাষ্ট্রদূতেরা সৈয়দপুর থেকে চিলাহাটি পর্যন্ত রেলপথের রুটটি পরিদর্শন করেছে। তাই বাংলাদেশের নীলফামারী জেলার সীমান্তবর্তী চিলাহাটি স্টেশন এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোচবিহার জেলার পুরাতন এবং দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকা হলদিবাড়ি স্টেশন দুটি ফের গমগম করবে। ঢাকা থেকে সরাসরি দার্জিলিং পর্যন্ত স্থাপিত হবে রেল যোগাযোগ। চিলাহাটি-হলদিবাড়ি ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট চালু করার লক্ষ্যে চিলাহাটি অংশে ৭ কিমি এবং ভারতের হলদিবাড়ি অংশে তিন কিমি রেলপথ নির্মাণ করলেই দু' দেশের মধ্যে এই করিডরে রেল যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হবে। চিলাহাটি থেকে চিলাহাটি বর্ডার পর্যন্ত ব্রডগেজ কানেক্টিভিটি স্থাপনের মাধ্যমে উপ আনলিক রেলসংযোগ স্থাপিত হলে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নেপাল ও ভুটানের আমদানি-রপ্তানিসহ বাণিজ্যিক কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হবে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের স্টেশন দুটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাবে। ২০১১ সালে রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন করে রেলের আধুনিকীকরণে কাজ শুরু করেছেন শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানায় ট্রেনের নতুন বগি নির্মাণের জন্য কারখানার আধুনিকীকরণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল হলদিবাড়ি-চিলাহাটি রেল যোগাযোগ। এই লাইনে ফের চালু হতে চলেছে রেল চলাচল। তাই খুশি এই অঞ্চলের আম নাগরিক।

১৯৭১ সালের পর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে চিলাহাটি রেলপথ বন্ধ হয়ে যায়। এই বন্ধ রেলপথ চালু করতে উদ্যোগ নিয়েছে দু' দেশেরই সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার এই রেলপথ চালু করার জন্য ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এনজেপি থেকে হলদিবাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি

PACKAGE TOUR 2018

Silk Route Tour
(Siliguri to Siliguri)

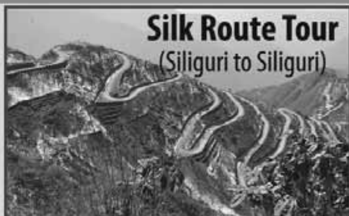

Date of journey 09/02/18, 28/02/18, 30/03/18, 13/04/18, 28/04/18, 04/05/18
2 Nights 3 Days
Rs 5200/- per head

Andamans Package Tour
(Port Blair to Port blair)

Date of journey 19/05/2018
7 Nights 8 Days
Rs. 18950/- (per head)

Kerala with Kanyakumari
(NJP to NJP)

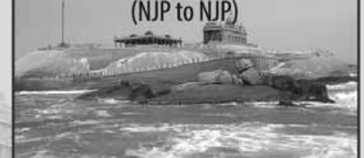

Date of journey 17/10/ 2018
14 Nights 15 Days
Rs.23600/-(per head adults)

HOLiDAYAAR
Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928
Jalpaiguri Off: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Rd. Jalpaiguri 735101 Ph: 03561-222117, 9434442866
Cooch-Behar Office: Ph: +91 9434042969

মোরগ লড়াই

ডুয়ার্সের হেথা হোথা

১

এক মানুষ উঁচু ভুট্টাগাছের দেয়াল বাঁ দিকে রেখে হেঁটে যাচ্ছি। ডান দিকে খেত। সেখানে খুদে খুদে গাছ দেখা গেলেও তাদের চিনতে পারলাম না। নিশ্চই কোনও সব্জি হবে। রাস্তাটা কাঁচা, তবে পাথর ফেলা হয়েছিল বছরখানেক আগে। অর্ধেকটা যাওয়ার পর সে পাথর অদৃশ্য। বাকি পথ কাঁচাই থেকে গেছে। মানছি যে চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের বানিয়া পাড়ায় লোকজন বেশি থাকে না— তা বলে কি রাস্তা কাঁচা থাকবে? পঞ্চায়েত প্রধান কি বর্ষাকালে বানিয়া পাড়ায় কোনও 'সাগাই'-এর বাড়িতে আসেন না? জনশ্রুতি বিশ্বাস করলে নাকি এ রাস্তার জন্য ফি বছর বরাদ্দ এবং খরচ দুইই হয়ে থাকে। আসন্ন পঞ্চায়েত যুদ্ধে তাই বিরোধী পক্ষের পয়লা হাতিয়ার হল রাস্তা। বিজেপির সমর্থক বিড়ি টানতে টানতে প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানিয়ে গেলেন যে, এবার জেতার পর রাস্তা বানিয়ে ফেলতে নাকি পনের দিনও লাগবে না।

কাঁচা রাস্তায় তিনি এতক্ষণ আমার সঙ্গেই হাঁটছিলেন। মুখ চেনা। গ্রেটার কোচবিহারের সমর্থক বলে জানতাম। এবার মনে পড়ল, তাই তো! গ্রেটারের লোকজন তো এখন মোদিজীর ভক্ত হয়েছেন। আলুওয়ালিয়া সাহেব যেমন গোর্খাল্যান্ডের খোয়াব দেখিয়ে দার্জিলিং থেকে জিতেছেন, তেমন ভাবেই গ্রেটারের সেন্টিমেন্ট ভাঙিয়ে কোচবিহার কব্জা করার কথা ভাবছে বিজেপি। অবশ্য আধঘণ্টা পর শাসক দলের সমর্থককে সে কথা বলতেই তিনি ফুৎকারে পুরোটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, বিজেপি ভাবছে বামের সঙ্গে জোট বেঁধে আমাদের হারাবে। তা জোট যদি হবে তবে দু'-দলই প্রার্থী দিল কেন?

বছর কয়েক হল ডুয়ার্সে ভুট্টা চাষে বেশ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। লোকাল মেড পপুলার কর্ন হাটে হাটে মেলে। চূড়াভাণ্ডার অঞ্চলে বর্ষার আগে ভুট্টা লাগিয়ে টু-পাইস রোজগারের অপেক্ষায় অনেকেই। মনে হয় পাট চাষের পাট চুকিয়ে ফেলতে এদিককার কৃষকদের বেশি সময় লাগবে না। রাস্তার দু'-পাশে নয়ানজুলিতে পাট পচান যেত অনায়াসে। ফোর লেন সড়ক তৈরির কারণে নয়ানজুলির ভূগোল বেমালুম বদলে যাচ্ছে। তা ছাড়া পাটে যত খাটনি তত পয়সা কোথায়?

মাস দেড়েক আগে কে জানি খবর দিল যে চূড়াভাণ্ডার অঞ্চলের কোথাও দারুণ স্ট্রবেরি ফলছে। স্ট্রবেরি খেতের ছবি তোলার জন্য টিম যাচ্ছে সেখানে। ময়নাগুড়ি থেকে কৃষি আধিকারিক পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন সেই খেতে। ময়নাগুড়ি ব্লকের কোথাও কোথাও ভাল স্ট্রবেরি ফলছে এবং তা বছর তিনেক আগে জলপাইগুড়ির বাজার থেকে ছশো টাকা কিলো দরে বিক্রি হয়েছে— এ সংবাদ আমার জানা ছিল। তাই ছবি তোলার টিমের গাড়িতে উঠে পড়েছিলাম কৌতূহল বশতঃ। কৃষি বিষয়ে আমার জ্ঞান হিব্রু ভাষার মতো। তাই হয়ত ভেবেছিলাম যে স্ট্রবেরি খেত বুঝি রোমান্টিক কোনও ব্যাপার হবে।

কিন্তু আধিকারিক এবং তাঁর সহযোগিরা যে আত্মবিশ্বাসে তাঁদের

ছবি নির্মাল্য ভট্টাচার্য

চূড়াভাণ্ডার গ্রামের রাস্তা এখনও কাঁচা

গাড়িকে 'ফলো' করতে বলে কয়েক কিলোমিটার ছুটলেন, সেটা ক্রমে কমতে শুরু করল। আমি অচিরেই আবিষ্কার করলাম যে আমরা হুসলুডাঙ্গা-সাপ্টিবাড়ি-চূড়াভাণ্ডারকে তিনটে বিন্দু ধরে নিয়ে ত্রিভূজাকারে ঘুরে চলেছি। তারপর খবর পেলাম যে আধিকারিক দিন কয়েক হল বদলি হয়ে ময়নাগুড়ি এসেছেন। স্ট্রবেরি খেতের কথা তিনি শুনেছেন। কিন্তু দেখেননি। তবে খুবই বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছেন।

চল্লিশ মিনিট ঘুরপাক খাওয়ার পর এক গেরস্তের ছোট উঠোনে মাথা ঢুকিয়ে, চলাচলের সরু পথটি বাধ্য হয়ে অবরোধ করে কোনও মতে একজোড়া গাড়ি পার্ক করে প্রবল উৎসাহে ভেতরে ঢোকা হল। সে এক আশ্চর্য স্ট্রবেরি খেত! দশ ফুট বাই দশ ফুট জমিতে তিন সারিতে মোট ন'-টা গাছ। আড়াইখানা স্ট্রবেরি ফলেছে। একটার অর্ধেক পচে গেছে। আধিকারিক বিস্ময়ে বললেন, 'এ কী! বললে যে কয়েক বিঘে?!'

চাষি হাসিমুখে জবাব দিলেন, 'সে তো গত বছর সার! দাম পাইলাম না। এবার বাদ দিলাম।'

'তবে এই যে কয়েকটা?'

জানা গেল সেটা নিয়মরক্ষার জন্য। স্ট্রবেরি গতবার লাগিয়েছিল। এবারও লাগিয়েছে। বিঘের বদলে স্কোয়ার ফিট ব্যাপারটা কী ভাবে সামলান হবে— এই প্রশ্নটা আর আধিকারিককে করতে পারিনি। কিছু জবাব প্রশ্ন না করেই পাওয়া যায়।

ভুট্টা গাছের দেয়াল পেরিয়ে রাস্তা বাঁক নিচ্ছে। সামনে একটা সদ্যোজাত কালভার্ট। নীলসাদা। বাঁশের বেড়া, টিনের চাল। উঠোন। মুরগি।

আমি একটু দাঁড়িয়ে পড়লাম। আদালতে পঞ্চায়েত দেবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে জোর তর্ক চলছে। বৈশাখের গোড়ায় হাওয়া-মেঘ-রোদ্দুরের দুপুর। অতি মনোরম পরিবেশ। খিদে খিদে পাচ্ছিল বলেই মনে হয় মুরগির মতো ক্লিশে প্রাণীটিকে আমি একটু মন দিয়ে দেখলাম। কিন্তু চিকেনের বদলে আমার মনে হল চিকেন ফাইটের কথা। না। চিকেন ফাইট কোনও নতুন রেসিপি নয়। ওটা মুরগি-লড়াই। মানে, মোরগ লড়াই।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের সঙ্গে মোরগ লড়াই-এর মিল পাচ্ছি নাকি আমি? হে গণতন্ত্রের ঈশ্বর! আমাকে ক্ষমা করা হোক।

খিদে খিদে পাচ্ছিল বলেই মনে হয় মুরগির মতো ক্লিশে প্রাণীটিকে আমি একটু মন দিয়ে দেখলাম। কিন্তু চিকেনের বদলে আমার মনে হল চিকেন ফাইটের কথা। না। চিকেন ফাইট কোনও নতুন রেসিপি নয়। ওটা মুরগি-লড়াই। মানে, মোরগ লড়াই। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সঙ্গে মোরগ লড়াই-এর মিল পাচ্ছি নাকি আমি? হে গণতন্ত্রের ঈশ্বর! আমাকে ক্ষমা করা হোক।

২

মোরগ লড়াই প্রথম দেখেছিলাম ডেঙ্গুয়াঝাড় বাগানের হাটে। সে হাটে আমাদের টাউনের ছাত্রযুবদের যাতায়াত ছিল দুটি কারণে। মোরগ আর হাঁড়িয়া। সাহেবরা তাঁদের দেশে এসব রক্তারক্তি খেলা বন্ধ করে দিলেও এশিয়া আর লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে তুমুল জনপ্রিয় খেলা হল মোরগ লড়াই। অনেক প্রাচীন খেলা। তবে বাজি বিনে এ খেলা জমে না। ডেঙ্গুয়াঝাড় হাটের সে লড়াই-এর অ্যাম্বিয়েন্সটা অবশ্য সাংঘাতিক ছিল! সে অ্যাম্বিয়েন্সে মাথা ঠান্ডা রেখে লড়াই করা কেবল মুরগির পক্ষেই সম্ভব। এ সব লড়াকু, ক্ষত্রিয় 'মুরগা' যাঁরা পালন করেন তাঁরা, পোষ্য জিতলে, টু পাইস রোজগার করেন। লড়াই শুরুর আগে বাজি ধরতে ইচ্ছুক জনগণের ভিড়, উদ্দীপনা আর কথোপকথনের ব্যাপারটা একটা জিনিস বটে!

ভেবে দেখুন যে সুকান্ত ভট্টাচার্য যখন 'একটি মোরগের কাহিনী' লিখেছিলেন তখন শিষ্টজনেরা মুরগি খেতেন না। তখন পাঁঠার যুগ। চিকেন বললে লোকে 'পক্স' ভাবত। কিন্তু সুকান্ত মোরগের বদলে পাঁঠার কাহিনি লিখলেন না। পাঁঠা হলে জমত না। এর কারণ হল পাঁঠার 'অতি বেচারা' ইমেজ। তুলনায় মুরগি অনেক বিদ্রোহী স্বভাবের। চলন-ডাক-ঘাড় তুলে তাকান— এ সবের মধ্যে একটা রোমান্টিক ব্যাপার আছে যা কি না সমাপ্ত হয় চিকেনে। জনগণ চিরকাল ভাল পর্যবেক্ষক। তাই হাটে হাটে পাঁঠার লড়াই দেখা যায় না। পাঁঠা আর লড়াই দুটো পরস্পরের বিরুদ্ধ পদ। আপনি কখনও ভাবতে পারেন যে রবীন্দ্রনাথ মালকোচা মেরে এসপ্লানেডে গোরা সার্জেন্টকে গরম দিচ্ছেন?

তাই মুরগিরাই লড়ে।

গ্রামে যাচ্ছিলাম পুজোর নেমন্তন্ন খেতে। রাজবংশী সমাজে বিষ্ণুদেব মোটামুটি জনপ্রিয়। সাদা পোষাক পরা, সচন্দন, তুলসীমাল্যভূষিত বৈষ্ণবদের দেখা যায় সাইকেল চালিয়ে ছুটছেন। গুটিকয় ভগবদপ্রেমে মগ্ন থাকেন নিশ্চই, কিন্তু বেশিরভাগই বৈষয়িক চিন্তার উর্দ্ধে ভগবানকে স্থান দেওয়ার ব্যাপারে ঘোরতর দ্বিধাগ্রস্ত। কৃষ্ণপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ উঠলে এরা তত্ত্বকথা আউড়ে বুঝিয়ে দেবেন যে সেটা খুব কঠিন ব্যাপার। অত সহজে হয় নাকি?

পুজো এদেরই একটা ক্ষমতাবান গোষ্ঠির গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে হবে। তিনি গেরুয়াধারী এবং গতিময়। আমি পৌঁছানোর কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি সপার্ষদ গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। ডুয়ার্সে এই বৈষ্ণব গোষ্ঠিগুলির কমন সুপ্ত ইচ্ছে হল একটা মন্দির বানিয়ে তার পরিচালক হয়ে বসা। কেউ কেউ জমিও যোগার করে রেখেছেন। এমন একজন যজ্ঞিবাড়ির দুয়ারে বসে পান চিবোচ্ছিলেন। তাঁর পাশে বসে জানতে চাইলাম, 'ভোট কী বুঝছ মামা?'

'পদ্মফুল পাচ্ছে এই পাড়াটা।'

মামাকে নাকি বিজেপির লোকের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে ক্ষমতায় এলে মন্দির হয়ে যাবে। গভর্মেন্ট করে দেবে। মামা আগে ঘাসফুল ঘেঁষা লোক ছিলেন। তাঁর আশা ছিল পঞ্চায়েত থেকে মন্দির বানিয়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু পঞ্চায়েত নাকি সাফ জানিয়ে দিয়েছে, সেকুলার দেশে গভর্মেন্ট একশো দিনের কাজের তালিকায় মন্দির তৈরি রাখতে পারে না।

পদ্মফুল এলে এসব কোনও সমস্যাই হবে না।

মামার কথাগুলো লিখলাম কারণ মামার মতো লোকেরাই ডুয়ার্সের গ্রামে গ্রামে পদ্মসুবাস ছড়িয়ে দেওয়ার তৃণমূল স্তর। মন্দির বানিয়ে ছড়ি ঘোরাবার সুপ্ত বাসনাকে উসকে দিয়ে চমৎকার খেলছে 'পৃষ্ঠা বিস্তারক' কমিটির সদস্যরা। তবে তাঁরা বাঘের পিঠে উঠেছেন। যেমন মামা বললেন, 'গান্ধিজী যে দেশের কী সর্বনাশ করে গেছেন তা লোক এখন বুঝছে।'

আমার খুব হাসি পেল। ডুয়ার্সে এমন শত শত মামা দিনরাত ছুটে চলেছে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের লক্ষ্যে। তাঁরা ভারতের ইতিহাস নতুন ভাবে জানছেন। প্রাচীন ভারত তাঁদের কাছে সবজান্তার দেশ। আজ যা কিছু দেখছ, সবই সে ভারত বানিয়ে ফেলেছিল।

নতুন প্রজন্ম কি মোরগ লড়াই দেখে অবাক?

৩

মামা কিন্তু ছেলের বিয়েতে 'ডিমান্ড' নিচ্ছেন একলাখি বাইক। দেড় লাখেরটা চেয়েছিলেন। মেয়ের বাড়িতে বেশ চাপ হচ্ছিল। তখন মামা ভাবলেন, কৃষ্ণ বলেছেন লোভ না করতে। পুজোর পর কীর্তনের আসরে তিনি খানিকক্ষণ চিৎকার করে গেয়েছেন। তাই বাড়ি চলে গেলেন চা খেতে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে মোরগ লড়াই এই উপমহাদেশ থেকেই বিশ্বে ছড়িয়েছিল। তখনও যিশু জন্মাননি। ভারতীয় 'লাল মোরগ'দের বিস্তর খ্যাতি ছিল লড়াকু হিসেবে। মামা শুনলে খুশি হতেন বটে! লড়াই-এর জন্য মুরগিকে তালিম দিতে সবাই পারে না। মামাকেও কি সবাই তালিম দিতে পারত? যুক্তিবিচারের ক্ষেত্রে 'ভ্রান্ত সাদৃশ্যি করণ দোষ' বলে একটা ব্যাপার আছে। যেমন— 'পৃথিবীর মতো নেপচুনও সূর্যের চারদিকে ঘোরে। তারও আহ্নিক-বার্ষিক গতি আছে। পৃথিবীর মতো তাই নেপচুনেও প্রাণ আছে।' অর্থাৎ, গুরুত্বহীন বিষয়ে মিল দেখিয়ে একটা বাজে যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা।

আমিও এমন একটা যুক্তি খাড়া করতে চাইলাম। 'মুরগির মতো মানুষেরও দুটো পা রয়েছে এবং ভোটের প্রাক্কালে কোনও কোনও মুরগির মতো কোনও মানুষকে পায়ে ছুরি লাগিয়ে কেউ কেউ ময়দানে নামিয়ে দেয়, যেমন মুরগিদের দেওয়া হয়। মুরগিদের মতো মানুষেরাও কেউ ভোটে হারে কেউ জেতে কেউ মরে যায়। তাই বঙ্গীয় পঞ্চায়েত ভোট আসলে নররূপী মুরগি লড়াই!'

প্রসাদ খেয়ে হাঁটতে বেরিয়েছি। কলাপাতার সরু সরু ফালি ফিতের মতো হাতে জড়িয়ে কয়েকটা বাচ্চা তুমুল খেলছে। শাসক দলের সমর্থক ক্লান্ত মুখে খৈনি ডলতে ডলতে হাঁটছে। আমিও হাঁটতে লাগলাম। পশ্চিম দিকে বিস্তির্ণ খেত। পুবে কম। কারণ একটা ছোট্ট নদী আছে। সেটা পেরিয়ে ওপাড়ে আবার হু হু ধানবাড়ি। তার আলপথ ধরে হেলথ সেন্টার আর হাইস্কুলে পৌঁছোবার শর্টকাট। নদীটা বাচ্চা হলেও বর্ষায় দু'-একবার

'গ্রামের বাজারে পঞ্চায়েতের আগে এ ধরনের আলোচনা মাত্র দু'-জনে বেশিক্ষণ চলতে পারে না। একটু পরে দেখা গেল প্রায় সাত-আট জন জুটে গেছে। সকলেই দিদিভক্ত। তবুও জোর তর্ক লেগে গেল। চায়ের দোকানি ফিসফিসিয়ে বলল, 'দুই মাতব্বরে লাগসে!' বোঝা গেল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ব্যাপার আছে।'

অতি বিচ্ছু হয়ে ওঠে এবং পাড়াটাকে অর্ধেক ভাসিয়ে দেয়। কাঁচা রাস্তা একটা বাঁক নিয়ে রথের হাটের পাকা রাস্তায় মিলে গেছে।

অনেক দিন আগে প্রবল ঝড়ে জল্পেশ মন্দিরে চূড়া উড়ে এসে যে এলাকায় পড়েছিল সেটাই চূড়াভাণ্ডার গ্রাম। বানিয়াপাড়া এই গ্রামের নবীন অংশ। জাতীয় সড়ক টপকে ওধারে গেলে চূড়াভাণ্ডারের সিংহভাগ মিলবে। নির্মিয়মান ফোর লেন সড়কের মাটি আর বালির পাহাড় ডিঙিয়ে ওধারে গেলেই পা পড়বে এক ভাঙাচোরা রাস্তায়। গ্রামের অন্যতম প্রধান রাস্তাটা কেন নতুন হয়নি, এ প্রশ্নের জবাবে শাসক দলের সমর্থক মামার মতো তত্ত্বকথা আওড়াতে শুরু করলে আমি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বিজ্ঞের মতো বললাম, 'বুঝতে পারছি। চলো ঝাঝাঙ্গি যাই।'

ঝাঝাঙ্গি'র বিখ্যাত জিনিস হল ধাবা। আসলে ঝাঝাঙ্গি একটি নদীর নাম। জাতীয় সড়কের দু'-পাশে দোকানপাট। বাজার। কাঁচা রাস্তা চলে গেছে রথের হাটের দিকে। এই এলাকার জোতদার তারিনী বসুনিয়া ব্রিটিশ আমলে ইংরেজদের বেশ ঘোল খাইয়েছিলেন। ব্রিটিশরা তাঁকে ধরতে না পেরে বেজায় রাগে হাতি দিয়ে তাঁর বাড়িঘর ভেঙে দিয়েছিল।

ঝাঝাঙ্গি এসেই খবর পেলাম ময়নাগুড়িতে প্রবল গোলমাল। ঘাসে-পদ্মে। খানিক পর জানা গেল, লড়াই হয়েছে ঘাসে-ঘাসে এবং 'প্রবল' কিছু নয়। চূড়াভাণ্ডারের লোকজন বাজার করতে ঝাঝাঙ্গি আসেন। সন্ধের মুখে আবহাওয়া অতি মনোরম হয়ে ওঠার কারণে বাজার বেশ গমগমে। দু'-চারটে দরকারি জিনিস কিনে চায়ের দোকানে বসে এলাচ দেওয়া অতিমিষ্টি দুধ চায়ে খেতে খেতে পাশের লোকটির দিকে তাকিয়ে হাসলাম। তিনি বললেন, 'কেমন আছেন?'

'ভোটের খবর কী?'

'দিদিই জিতবে।'

'বিজেপি?'

'ওদের পজিশনও ভাল। তবে জিতবে না।'

গ্রামের বাজারে পঞ্চায়েতের আগে এ ধরনের আলোচনা মাত্র দু'-জনে বেশিক্ষণ চলতে পারে না। একটু পরে দেখা গেল প্রায় সাত-আট জন জুটে গেছে। সকলেই দিদিভক্ত। তবুও জোর তর্ক লেগে গেল। চায়ের দোকানি ফিসফিসিয়ে বলল, 'দুই মাতব্বরে লাগসে!' বোঝা গেল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ব্যাপার আছে। আলোচনায় বার বার উঠে আসছে ময়নাগুড়ি নিবাসী এক কন্ট্রাক্টরের নাম। চূড়াভাণ্ডার-রথের হাটের যাবতীয় পঞ্চায়েতি নির্মাণে তাঁর একচেটিয়া বরাত। কী একটা কাজে পঞ্চাশ ব্যাগ সিমেন্ট কে জানি মেরে দিয়েছিল— সেটাও নাকি সেই ময়নাগুড়িবাসীর সৌজন্যে।

আমি কেটে পড়লাম। মাথা থেকে কিছুতেই মুরগির উপমাটা যাচ্ছে না। সন্ধের পর পুজোবাড়িতে আবার ফিরে এসে দেখি তখনও বেশ জমজমাট। এ সব গ্রামে ভোটের প্রচার শুরু হয় সন্ধের পর। চলে বেশ রাত্তির অবধি। পাড়ার ছোটো-মেজো নেতাদের এ সময় প্রতিদিনই ছোটখাটো পিকনিকের আয়োজন করতে হয়। ভোটের মিটিং মানে খাসির মাংস আর গরম ভাত। দেশি মানুষ ব্রয়লার এড়িয়ে চলে। 'মওসম' যদি বলো তবে খাসির। আগে মাথা পিছু এক সের ধরা হত। এখন মাগ্যিগণ্ডার বাজারে পনের জনের মিটিং হলে অন্ততঃ দু'-কেজি খাসি। নেতার খরচ মিনিমাম হাজার টাকা।

মামাদের আবার অত খরচ নেই। কারণ তাঁরা নিরামিষাশী। কিন্তু বুথের সাড়ে পাঁচশো ভোটারের সবাই তো আর বৈষ্ণব নয়। তাই সব মিটিং কি মাংস ছাড়া সম্ভব? শাসক দলের প্রার্থী মুচকি হেসে বললেন,

‘তা হলেও খরচা নাই। মিটিং-এ লোক আসলে না খরচা!’

চূড়াভাণ্ডার গ্রামে আমি মাঝে মাঝেই আসি। বানিয়াপাড়ার ওপর দিয়ে সারা দিন অনেক বিমান, হেলিকপ্টার, যুদ্ধ বিমান উড়ে যায়। এখান থেকে পূবে ধূপগুড়ি আর পশ্চিমে ময়নাগুড়ির দূরত্ব সমান। বাইক চাপলে জটিলেশ্বর মন্দিরে যেতে লাগে দশ মিনিট আর জল্পেশ যেতে বড়োজোর আধঘণ্টা। ঝাঝাঙ্গি ধাবা তিন কিলোমিটার দূরে। বানিয়াপাড়ায় বিদ্যুৎ এসেছে চার বছর হল। গতবার এদিকে একতরফা জিতেছিল ঘাসফুলের দল। এবার এখানে অভূতপূর্ব কিছু ঘটার সম্ভাবনাও নেই। বাজারে জোর গুজব যে রথের হাটে কিছু বামপন্থী ভোট আছে এবং সে সব বিজেপির বাক্সেই পড়ছে। একদা প্রতাপান্বিত বাম নেতা ফিসফিসিয়ে আমাকে বলেছেন, ‘বিজেপির ভোট আমরা পাচ্ছি।’ সব মিলিয়ে অঘটন ঘটার সম্ভাবনা কম। বিজেপি সম্ভবতঃ দ্বিতীয় হবে।

কিন্তু এখানে কৃষি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সুযোগ ছিল। স্ট্রবেরির কথা বলেছিলাম। ইদানিং সামার স্কোয়াশ নামক একটি সব্জি হাটেবাজারে বিকোয়। শুনেছিলাম যে রথের হাটে সে সব্জি ফাটিয়ে চাষ হচ্ছে। সেই দুর্দান্ত চাষকর্ম দেখার পর খুব হতাশ হয়ে স্থানীয় শঙ্কর বিড়িতে আগুন ধরিয়ে ভাবলাম, এ নিয়ে কেন ভাবছি! গতানুগতিক ফসলের বাইরে অন্য কিছু চাষ করা কি ভোটের বিষয় যে তা নিয়ে চর্চা হবে? দু’-দিন পর আদালত ভোট নিয়ে রায় দেবে। হয়ত পিছিয়ে যাবে ভোট। চূড়াভাণ্ডারের রাস্তাগুলো ভোট পেরোলেই যে ঝকঝকে হয়ে যাবে, এ প্রতিশ্রুতি গতবারের মতো এবারেও দেওয়া হচ্ছে। দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে কোথায় কোথায় দাঁড়িয়ে আছে ‘উন্নয়ন’। এই গ্রামে মুসলিমরা প্রায় নেই বললেই চলে। তাই এখানে দারুণভাবে জিতে ঘাসফুলকে প্রমাণ করতে হবে যে কেবল হিন্দুরা ভোট দিলেও তারা জেতে।

রাতের বেলা পুজোবাড়ির বাইরে বাঁশের বেঞ্চিতে পা ঝুলিয়ে জোর গপ্পো হচ্ছে। ঝাঝাঙ্গি থেকে টোটো চেপে কেউ এসেছে প্রসাদ খেতে। টোটোচালক গল্প জুড়েছেন। আমরা তিন-চারজন শ্রোতা। টোটোচালক বলে চলেছেন মেয়েদের নিয়ে। মেয়েদের বুদ্ধি নাকি ছেলেদের তুলনায় পনের শতাংশ কম। বেদ-পুরাণ-রামায়ণে নাকি এ কথা বলা হয়েছে। ধর্ষণের প্রসঙ্গে টেনে তিনি অবলীলায় মেয়েদের দায়ি করলেন। আমি চুপচাপ শুনছিলাম। এক সময় তিনি থামলেন। আমি নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিগ্যেস করলাম, ‘বিজেপি করেন নাকি?’

‘ভাবছি।’

এই লেখা শেষ করছি যখন, আদালতের নির্দেশে মনোনয়ন জমা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত দিনটি গড়িয়ে গেছে। গুলি-বোমা-রক্তপাত-হিংসার আরও একটা দৃশ্য অভিনীত হয়েছে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে। সেদিন রাতটা চূড়াভাণ্ডারে কাটিয়ে পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙেছিল জানলার পাশে মুরগির ডাকে।

আসলে মুরগিটা বলেছিল— ‘বঙ্গজোড়া পঞ্চায়েতের হাটে দোপেয়ে মুরগির লড়াই শুরু হচ্ছে! কোঁকর কোঁ!’

ঠিকই বলেছে! নিজের পায়ে ছুরি বেঁধে নেমে পড়েছে মুরগির দল। ফি ইলেকশনে পঞ্চায়েত দেবীর কিছু বলির দরকার হয়। বলির রক্তে সুস্বাদু হয় দেবীর প্রসাদ— যেন ‘বঙ্গ জীবনের ম্যাঙ্গো!’

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

কিছু ছবি ওয়েব ম্যাগাজিনের সৌজন্যে

মন চায় মোর চায়
DOOARS
Mon Chai More Chai

আড্ডাঘর

যৌথ পরিচালনায়

শ্রীমতী ডুয়ার্স

এখন ডুয়ার্স

THE addaghar CLUB

মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

A Community Development Project by NATIVE ECO SUSTAINABLE TOURISM SOCIETY

লাটপাঞ্চার

বিজ্ঞাপন না করলেই বেঁচে থাকতে পারে ইকো টুরিজম

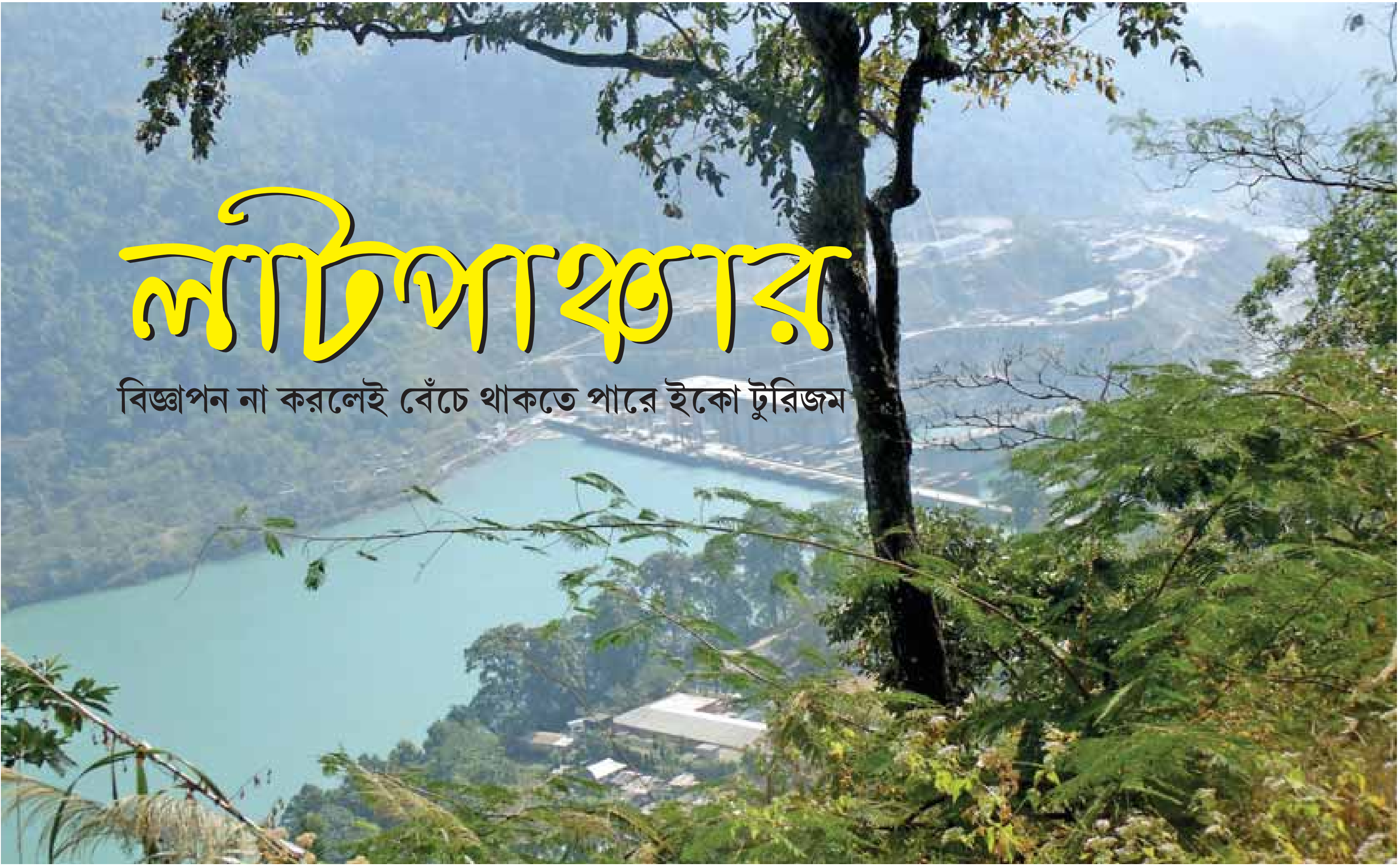

লাটপাঞ্চার থেকে কালীঝোরা ড্যাম

নতুন যে কোনও টুরিস্ট স্পটই বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সৌজন্যে অতি জনপ্রিয় হলে পর্যটকের ভিড়ে বিঘ্নিত হয় সেখানকার অকৃত্রিম কোমল প্রকৃতি, পাখি, জীবজন্তু, মানুষ। বরং অবিজ্ঞাপিত থেকে, বেড়ানোর গল্পের মধ্য দিয়ে ধীরেসুস্থে প্রচারিত হোক সেই ইকো পর্যটনের মহিমা।

শিলিগুড়ি থেকে বের হতে একটু দেরি হয়ে গেল। কারণ রাস্তায় খাবার জন্য কিছু ড্রাই ফুড তো কিনতে হবে। এত সকালে দোকান খোলা পেতে একটু সমস্যা হয়েছিল। চলেছি লাটপাঞ্চারে। অবসর বিনোদন এবং ছেলের ইচ্ছায় হর্ণবিলসহ অন্যান্য পাখির সন্ধানে। শিলিগুড়ির কংক্রিটের জঙ্গল আর যানজট পেরিয়ে সেবক রোড ধরে একটু এগোলেই পথের দু'ধারে মহানন্দা অভয়ারণ্য শুরু। অরণ্যের বুক চিরে মসৃণ পিচপথ তীরের মতো চলে গেছে দূরের কালচে নীল পাহাড়সারির দিকে। পথের দু'ধারে শাল গাছের জঙ্গল। ডালপালা এসে পড়েছে পথের ওপর, যেন দখল নেবে পথের। অবশ্য আশপাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মাঝে মাঝে বন্যজন্তুরা এ পথের দখল নেয় বৈকি। তখন পথের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে গাড়ি, কাচ্চাবাচ্চাসহ মা হাতির রাস্তা পেরোনোর অপেক্ষায়। এগোনোর ঝুঁকি কে নেবে? এই অরণ্যের বুক চিরে গেছে রেললাইন। সে লাইনেও সময় সময় উঠে পড়ে কোনও হাতি বা বুনো গাউর। তখন যদি ট্রেন এসে যায় তাহলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। ট্রেন থামে না। ট্রেনের ধাক্কায় মারা যায় হাতি আর গাউর। মহানন্দার এই পথে এলে আমার মন ভাল হয়ে যায়। মিষ্টি হালকা হাওয়া বয়ে যায় এখানে। সে হালকা হাওয়ায় বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে পায়ে চলা যেসব কাঁচা পথগুলো চলে গেছে নিবিড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এদিক ওদিক, তারই একটা ধরে কল্পনায় হাঁটা দিই। হারিয়ে যাই এদিক-ওদিক। কিন্তু সত্যি সত্যি হারিয়ে যেতে পারলাম কই? চিরটাকাল তো নির্দিষ্ট পথরেখা ধরেই যাতায়াত। বৃক্ষচ্ছেদন, ভয়ংকর জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, বেনিয়মি কাজকর্মে পাহাড়ের অনাবিল সৌন্দর্য হারিয়ে গেছে। সেবক পাহাড় থিকথিক করছে যানবাহন আর লোকজনের ভিড়ে। কালিঝোরাতে জলবিদ্যুতের ব্যাপক কর্মযজ্ঞ চলছে। সেবক রোডের ভিড়, শালুগাড়া বৌদ্ধ গোম্ফা, ফৌজি এরিয়া পার হয়ে বেঙ্গল সাফারি পার্ক। তারপরেই নীরব-নিস্তব্ধ শালকুঞ্জ। বন দফতরের উদ্যোগে চমৎকার পিকনিক স্পট। শিলিগুড়ি শহরের যানজটমুক্ত প্রকৃতির খোলামেলা, শান্ত, নির্জন পরিবেশ, মোমমসৃণ জাতীয় সড়ক, দু'ধারে নিবিড় শালবন, মহানন্দা অভয়ারণ্যের অংশ, চমকডাঙ্গি পেরিয়ে গেলাম।

সেবক লেভেল ক্রসিং ছাড়ালেই আঁকাবাঁকা পথের শুরু। বাঁ দিকে সেভকেশ্বরী, ভক্তবৃন্দের নিত্য ভিড়, লাইন ধরে গাড়ি দাঁড়ানো। সেবক পাহাড়ে যেভাবে বৃক্ষচ্ছেদন হয়েছে এবং হচ্ছে বা ইমারত গড়ে উঠছে তা এখনই কঠোর আইন করে বন্ধ করা উচিত। সেভকেশ্বরী পার হয়ে বাঘপুল। পথের দু'পাশে বানরের দল ছানাপোনাসহ বসে আছে। বাঘপুলের মাঝে সফেন সবুজ, কখনও তুঁতে রঙের তিস্তা অপরূপা। ফুটফুটে চাঁদনি রাতে বাঘপুলে দাঁড়িয়ে থাকলে এক অপরূপ অনুভূতি সৃষ্টি হয়। বাঘপুল থেকে ডান দিকে মংপং হয়ে রূপসী ডুয়ার্স। বাঁ দিকে সিকিম বা কালিম্পং যেদিকেই যাওয়া যাক না কেন, চোখ ভরে প্রকৃতিকে শুধুই উপভোগ করা। দেখতে দেখতে এসে পড়ে করোনেশন ব্রিজ। সুন্দরী তিস্তার ওপর ভারী দৃষ্টিনন্দন সেতু। তিস্তার সবজে-নীল জল এখানে বয়ে চলেছে মন্দাক্রান্তা ছন্দে। বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় সুন্দরী যেমন নিজেকে সংযত করে, সংহত করে—তেমনই সমতলে নামার আগে সুন্দরী তিস্তা নিজেকে সংযত করেছে। সেই শান্ত, সুন্দর কোলাহলমুক্ত সেবক হারিয়ে গেছে। চারিদিকে এখন গিজগিজে মানুষের মাথা। ধাবা, পেট্রোল পাম্প, দোকানপশার, চোলাইয়ের ঠেক, মন্দির, নানা কিসিমের লোকজনে জমজমাট। যেন নেই কাজ তো খই ভাজ। বাঁদরের উৎপাতে টেকা দায়। ডান দিকে রূপবতী তিস্তা হাত বাড়ালেই যেন ছোঁয়া যায়। তিস্তার বাঘপুলের উপর দাঁড়িয়ে যখন নিজের মনেই ইতিহাসের চর্বিতচর্বণ করছি তখন হঠাৎ সম্বিৎ ফিরল যে আর বেশি দেরি করলে লাটপাঞ্চারে পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে, আবার রওনা হলাম।

পাহাড়ে ঘোরা যদি নেশা হয়, আর বার্ড ওয়াচিং এর হবি থাকে, তবে বেড়াতে যাওয়ার আদর্শ জায়গা হতে পারে শিলিগুড়ি থেকে মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার

দূরে ছোট্ট গ্রাম লাটপাঞ্চার। গরমের একটা উইক এন্ড কাটিয়ে আসা যেতেই পারে। মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির সবচেয়ে উঁচু জায়গাটি হল লাটপাঞ্চার। তিস্তার অপূর্ব ল্যান্ডস্কেপ বিউটি, সিঙ্কোনা বাগিচা আর বহু রকমের পাখি চোখে পড়বে এখানে গেলে। হর্ণবিলসহ আরও অজস্র পাখির দেখা মেলে লাটপাঞ্চারে। আর ক্যামেরাসহ ছবি শিকারির দেখা পাওয়াটা সাধারণ ব্যাপার। স্থানীয় গাইডের সাহায্য নিলে বার্ড স্পট করতে সুবিধে হয়। স্যাংচুয়ারির আনাচকানাচে পায়ে হেঁটে ঘুরলেই চোখে পড়বে নানা ধরনের পাখি। কাছেই মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত বাড়িটা দেখে আসা যায় এখান থেকে। তাছাড়া পাঁচ কিলোমিটারের মতো দূরে আহালদারাতেও অনেকেই যায়। সেখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্যপট অসাধারণ। পাহাড়ের সবুজ চোখ জুড়িয়ে দেয়। সবুজে মোড়া চারদিক আর পাহাড়ের ঢালে ছোট ছোট বাড়িগুলো দেখলে মনে হবে বাকি জীবনটা বোধহয় এখানেই কাটিয়ে দেওয়া যায়। হাঁটাহাঁটির অভ্যাস থাকলে জঙ্গলের মধ্যে ছোট ছোট ট্রেক করা যায়। পাইন বনের পথ ধরে হাঁটতেও দারুণ লাগে। অক্টোবর থেকে এপ্রিলের মধ্যেই লাটপাঞ্চার যাবার সেরা সময়কাল। শুনলাম গরমকালে গেলে বিকেলের দিকে হয়ত একটু বৃষ্টি পাওয়া যেতে পারে।

কালিঝোরা ছাড়াবার পর থেকেই রাস্তাটা একটু খারাপ। গাড়ি ভাড়া করে নিয়েছিলাম নিউ জলপাইগুড়ি থেকেই। করোনেশন সেতু অতিক্রম করে গ্যাংটকগামী পথে কালিঝোরা থেকে আরেকটু এগোলেই বামহাতি আধা পিচ-আধা বোল্ডারের পথ উঠে গেছে উপরে। সেই পথে প্রায় ১৪ কিলোমিটার চলে এসেছি। বিশ্রী বোল্ডারের সংকীর্ণ রাস্তা। আশেপাশে জনবসতি। বোল্ডারমিশ্রিত পথে এতোকাল ট্রেকিংয়ের অভিজ্ঞতা হয়েছে। এবারে হল অন্য অভিজ্ঞতা যা মোটেও স্বস্তির নয়। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত লোকালয় ছাড়িয়ে একটা বিস্তীর্ণ মোরামের পথের ওপর এসে পড়লাম। দু' পাশে ভারি সুন্দর গাছের সারি। মাঝখান দিয়ে খয়েরি রঙের কাঁচা রাস্তাটি ক্রমশ উচ্চতায় উঠতে উঠতে একসময় গাছগাছালি ঘেরা একটি কংক্রিটের বাড়ির সামনে এসে শেষ হল। গাড়ি থেকে নেমে চারপাশটা দেখে বুঝলাম,

আহালদারা হোম স্টে, নীচে রুফাস সিবিয়া, ছবি শৌণক চক্রবর্তী

> পরদিন খুব ভোরে গাড়ি করে চলে গেলাম পাঁচ কিলোমিটার দূরে আহালদারায় সূর্যোদয় দেখতে। সবুজ টেবলটপের ওপর পিকচার পোস্টকার্ড থেকেকেটে বসানো তিনটে লাল সবুজ সাদা কটেজ। রাতের তুমুল বৃষ্টির শেষে এ দিন সকালে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ঝিকমিকিয়ে ওঠেনি হীরের মুকুট পরা কাঞ্চনজঙ্ঘা।

একান্ত নির্জনতায় পাহাড়ি টিলায় এই আবাসটি ছুটি কাটানোর আদর্শ জায়গা। দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত এই জায়গাটি ততটা পর্যটক মুখর নয়। একটু ভিন্ন স্বাদের জায়গা। জনপ্রিয়তা কম বলে অনায়াসেই বুকিং পাওয়া যায়। পদম গুরুঙের হর্ণবিল নেস্ট হোম স্টে হিসাবে থাকার ভাল জায়গা। এছাড়াও অন্য হোম স্টে রয়েছে। ওয়েবসাইট দেখে আগে থেকে বুকিং করে যাওয়া যায়। সমুদ্রতল থেকে প্রায় চার হাজার ফুট উঁচুতে দার্জিলিং জেলার এক ছোট্ট শান্ত পাহাড়ঘেরা গ্রাম লাটপাঞ্চারে পদম বাহাদুর গুরুং-এর হোম স্টেতেই আমাদের থাকার জায়গা (যোগাযোগ ৯৪৭৫৯ ৫৯৯৭৪)। দোতলা ছিমছাম সুন্দর বাড়ি, সামনে প্রচুর ফুলগাছ, আরামদায়ক কাঠের ঘর। মালপত্র রেখে, খাওয়াদাওয়া সেরে সেদিনের মতো সামান্য হাঁটাহাটি আর নিপাট আড্ডা দিয়ে শুয়ে পড়লাম সবাই। আমাদের এখানে আসার প্রধান কারণ প্রকৃতি দর্শন আর রুফাস নেকড হর্ণবিল দেখা। পদমজি শুতে যাওয়ার আগে আমাদের পরদিন সকালে আগে সামনের নার্সারিতে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

পাহাড়ি দুই ক্ষুদে

সেইমতো ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই বেরিয়ে পড়া গেল। আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী পদমজির ভাইপো মঞ্জিলকে গাইড হিসাবে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম নার্সারির দিকে। হোম স্টে থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে এই ছোট্ট নার্সারি। যাবার রাস্তায় নাকি অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত সুন্দর সব পাখি দেখতে পাওয়া যায়। ক্যামেরা

নিয়ে তাই আমরা হেঁটে যাওয়াই স্থির করলাম। কুয়াশার চাদর তখনও পুরোপুরি সরেনি। শীতের আলস্য জড়ানো শান্ত পরিবেশ, ছোট ছোট কাঠের বাড়ি, রাস্তার দু'পাশে সিঙ্কোনা গাছের সারি। হঠাৎ খট খট খট খট খট খট, এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি গ্রে হেডেড উডপিকার। আলো একদমই ভাল না থাকায় ভাল ছবি তুলতে পারলাম না। আরো একটু এগোতেই সকালের খাবার জোগাড়ে মহাব্যস্ত দুটো ব্লু হুইসলিং থ্রাশ। মাথা তুলে আমাদের দেখতে পেয়ে হকচকিয়ে হাওয়া। নার্সারি যাওয়া-আসার এই রাস্তাতে আমরা দেখলাম লাফিং থ্রাশ, গ্রেট হর্ণবিল, ভার্ডিটার ফ্লাইক্যাচার, লিফবার্ড, ব্লু রকথ্রাশ, উডশ্রাইক, ফালভাস ব্রস্টেড উডপিকার, ব্রাউন ফ্রন্টেড উডপিকার এবং অদ্ভুত সুন্দর সুলতান টিট। অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে চুপিসারে ঝোপঝাড় কেটে মঞ্জিল আমাদের দেখাল কমন ফ্লাইক্যাচার। দুপুর পর্যন্ত মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির আনাচকানাচে ঘুরে বেড়ালাম পাখির খোঁজে। একটা অসাধারণ বিষয় আমার মনোজগতকে নাড়া দিলো। সেটা হল পদমজী বা মঞ্জিলের পাখি প্রজাতি কিন্তু মুখস্থ। অবলীলাক্রমে বলে দিল প্রতিটি প্রজাতির নাম। কিন্তু কোনওটারই সেরকম ভাল ছবি তোলার সুযোগ পেলাম না। কারণ পর্যাপ্ত আলো ছিল না। তবে মেঘ-রোদ্দুরের খেলা ছিল বলে ছেলের ক্যামেরায় অবশ্য রুফাস সিবিয়া, ভার্বিড্যান্ট ফ্লাইক্যাচারের ছবি এসেছে। তাই প্রাপ্তির ভাঁড়ার একেবারে শূন্য নয়। ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট সেরেই বেরিয়ে পড়লাম রুফাস নেকড হর্ণবিলের খোঁজে। খয়েরি রঙের গলাওয়ালা এই বিশাল ধনেশ পাখির বর্তমান স্টেটাস অত্যন্ত মূল্যবান। অর্থাৎ ঠিকমতো সংরক্ষণ না করলে অদূর ভবিষ্যতে অবলুপ্ত হতে পারে এরা। শুধুমাত্র খাবার জন্যই নয়, পালক, ঠোঁট ইত্যাদির আকর্ষণে আদিবাসী এবং বিভিন্ন উপজাতির লোকেরা এদের শিকার করে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে এদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আমাদের দেশে শুধুমাত্র অরুণাচল প্রদেশ, বক্সা আর মহানন্দা অভয়ারণ্যে এদের দেখা যায়।

কিছুক্ষণ পাহাড়ি নিস্তব্ধতা আর স্কারলেট মিনিভেট, গ্রেট বারবেট, ট্রি ক্রিপার, নানা রঙের নাম না জানা প্রজাপতিদের চঞ্চলতা উপভোগ করে একরাশ ভাললাগা নিয়ে হোটেলে ফিরলাম। দুপুরে কাছেপিঠে হাঁটতে বেরিয়ে দেখলাম এলাকায় চারখানা ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল আছে। ছোট ছোট দোকান এবং একটা হাসপাতালও আছে। ১৯৭৫ সালে তৈরি। হোম স্টে'র ম্যানেজার জানালেন, গরমকালে পিক সিজনেও এই জায়গা ফাঁকাই থাকে। আমি এবং আমার ছেলে শৌণক সামান্য পাখিপ্রেমিক মাত্র, পাখি নিয়ে গভীর পড়াশোনা নেই। বরং পাখির চালচলন, রং চেহারা, এগুলোই আমাদের বেশি আকর্ষণ করে। ক্যামেরা নয়, বাইনোকুলার আমার নিত্যসঙ্গী। তাই পাখি দেখতে দেখতে তাদের জগতে ঢুকে পড়াটা আমার নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। এই অঞ্চলে প্রায় সব পাখিদেরই অস্থায়ী ঠিকানা হল গুরুংজির হর্ণবিল নেস্ট। এক দর্শনীয় জায়গা হল ভাবীর একতলার বারান্দার সার্কিট। বিশাল বিশাল সাইজের ক্যামেরা নিয়ে নানান পোশাকে সেজে নানা মূলুক থেকে নাকি সিজন টাইমে আসে হার্ডকোর পাখিবাজের দল। যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব চারিদিকে। বেশ রোমাঞ্চকর লাগল শুনতে। গুরুংজির কাছ থেকে জানলাম শক্ত মোটা ঠোঁট, বাদামি রঙের মাথা কালচে, নীল রং। ডানার শেষের দিকের পালক সাদা। গ্রেট হর্ণবিল। শিলিগুড়ি মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির কাছে লাটপাঞ্চারের জঙ্গলে এই ধরনের হর্ণবিল দেখা যায়। কাছ থেকে ছবি তোলা নিষিদ্ধ, তাই দূর থেকেই সাধ মেটাতে হয়। সকাল-সন্ধ্যা ক্যামেরা জুম করে একের পর এক ক্লিক। বাংলার ধনেশ পাখির ইংরেজি নাম হর্ণবিল। বাহারি রং, খাদ্য প্রণালী, সামাজিকতার জন্য পাখিপ্রেমিকদের বিশেষ আকর্ষণ এই পাখি। এই হর্ণবিলের নেশায় পাড়ি দিয়েছি লাটপাঞ্চারের জঙ্গলে। ভারতে নয় ধরনের হর্ণবিল পাওয়া গেলেও আমাদের ক্যামেরায় বন্দি হল না গ্রেট হর্ণবিল।

পরদিন খুব ভোরে গাড়ি করে চলে গেলাম পাঁচ কিলোমিটার দূরে আহালদারায় সূর্যোদয় দেখতে। সবুজ টেবলটপের ওপর পিকচার পোস্টকার্ড থেকে কেটে বসানো তিনটে লাল সবুজ সাদা কটেজ। রাতের তুমুল বৃষ্টির শেষে এ দিন সকালে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ঝিকমিকিয়ে ওঠেনি হীরের মুকুট পরা কাঞ্চনজঙ্ঘা। তবে বহুদূরে পাহাড়ের ঢালে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট ছোট্ট ঘরবাড়ি। অনেক নিচে বয়ে চলেছে রুপালি তিস্তা। কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে সূর্যোদয় নাকি এখানে অসাধারণ সুন্দর। সকাল সাড়ে পাঁচটায় পৌঁছে গেলাম, গাড়ি থেকে নামতেই প্রবল হাওয়া আর সঙ্গে বেশ ঠান্ডা। আর একটু উপরের দিকে যেতে মেঘ যেন কান ছুঁয়ে যায়। প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে আমরা দাঁড়িয়ে। যতদূর চোখ যায় খালি পাহাড় আর পাহাড়। নিচের দিকে তাকালে খাদ পেরিয়ে চোখ গিয়ে পড়বে প্রবাহমান তিস্তার ওপর। হলদিবাড়ি পর্যন্ত দেখা যায় তার গতি। উপত্যকার বুক চিরে সে বইছে। এদিকের আকাশ অবশ্য সেদিন পরিষ্কার ছিল না। তাই কাঞ্চনজঙ্ঘা রেঞ্জ আমরা দেখতে পাইনি পরিষ্কার করে। তবে তাতে কিছুমাত্র যে দুঃখ রয়েছে তা নয়, ঘন সবুজের ভিড়, মেঘ আটকে থাকা পাহাড়, শেষ না হওয়া উপত্যকা কথায় লিখে প্রকাশ করা যাবে না।

> ❛ যেখানে পাহাড়ি নির্জনতা, সাবেকি একটি বনবাংলো, ঢেউ খেলানো পর্বতরাজি, হাঁটা পথে ঘন হয়ে আসা অনাঘ্রাত অরণ্য, অজানা-অচেনা পাখিদের কলকাকলি আর শিরশিরানি হাওয়ায় বিদ্যুৎবিহীন নিশুতি রাত সবমিলিয়ে রহস্যভরা প্রকৃতির ছন্দময় কোলাজ যেন এক মায়াময় জগত ❜

বেশ কিছুক্ষণ পর আমরা ওখান থেকে বেরোলাম। কয়েক মিনিটেই চলে এলাম নামথিং লেকে। ওদের ভাষায় নামথিং পোখরি। সিঙ্কোনা আর পাইনগাছে ঘেরা এই বৃষ্টির জলে পুষ্ট লেকে আমরা যখন গেলাম জল ছিল না, নানারকম পাখি ছাড়াও এখানে পাওয়া যায় দুর্লভ হিমালয়ান স্যালামান্ডার। তবে বর্ষার সময়েই পাওয়া যায় এদেরকে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। সঙ্গে অল্পক্ষণের বৃষ্টিপাত আমাদের কিছুটা সময় হলেও ঘরে বন্দি করে রাখল। আকাশ পরিষ্কার হলে উজ্জ্বল রোদ। সাড়ে তিনটে নাগাদ স্নান খাওয়াদাওয়া সেরে ছড়ানো রোদে চেয়ার টেনে বসলাম। শীতের প্রকোপ ভালই। খাওয়াদাওয়ার পর সেটা যেন বেড়ে গেল। বাংলোর নিচের রাস্তায় নেমে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঠান্ডা মালুম হল। একেই সারাটা দিন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, তার ওপর কয়েক পশলা বৃষ্টি। মুহূর্তে তাপমাত্রা অনেকটা নেমে গেল। বাংলার নিচে পায়ে হাঁটা পথ হালকা গাছগাছালির ভেতর দিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে জঙ্গলে প্রবেশ করেছে। জঙ্গলের দিকে হাঁটা দিলাম। নিচে লাটপাঞ্চার বিট অফিস। সেই বিট অফিস অতিক্রম করে ঢালুপথ প্রবেশ করেছে গভীর জঙ্গলে। প্রায় এক কিলোমিটার হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি। ক্রমশ উৎরাই পথ অরণ্যপথের গভীরে প্রবেশ করেছে। ঢালুপথের ডান প্রান্তে অতলান্ত খাত। সেখানে শুধুই গাছের সারি। ওপর থেকে নিচের সীমানা বোঝা সম্ভব নয়। বাঁ দিকে গাছেদের সংসার ক্রমশ উচ্চতায় উঠে গেছে। শোনা গেল এই ঢালুপথ সুকনা লেকে গিয়ে মিশেছে। গ্রামবাসীরা নাকি এই পথ দিয়েই যাতায়াত করে। আমরা যতক্ষণ অরণ্যে হাঁটলাম একজনেরও দেখা পেলাম না। অরণ্য যেমন ঘন, তেমন গহীন।

কিছুটা হেঁটে গিয়ে দেখি খোলা জায়গা, ভিউ পয়েন্টের মতো। দূরে কুয়াশা জড়ানো কিছু কিছু পাহাড়ি টিলা। তাতে ছড়ানো-ছিটানো কিছু ঘরবাড়ি। দূরে আরও দূরে আকাশের সীমানায় পর্বতমালার বিস্তৃত অবস্থান। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম এই যে ১৮০ ডিগ্রি কোণে এখানে সারিবদ্ধ পর্বতমালা অবস্থান করছে সেখানে আর অন্য কিছু নয়, আছে কাঞ্চনজংঘা, কাবরু, লোৎসু, পান্ডিম প্রভৃতি। অর্থাৎ পরিষ্কার আকাশে বরফের মুকুট পরা সেই সব পর্বতরাজির অনির্বচনীয় শোভা কেমন হতে পারে সেটা কল্পনা করে রোমাঞ্চিত হলাম। বাইনোকুলার এবং ক্যামেরার টেলিলেন্সের সাহায্যে মেঘলা হাওয়ার ভিতরে সেই সব পর্বতরাজি খুঁজে পাওয়ার কিছুটা চেষ্টা চালালাম। খাঁজকাটা বেশ কিছু স্কেচ চোখে ধরা পড়ল বটে, কিন্তু তাতে মন ভরল না। পর্যটক মহলে এই মোহদৃশ্যের জন্য লাটপাঞ্চারের একটি উল্লেখযোগ্য পরিচিতি আছে। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে এ যাত্রায় আমরা তা থেকে বঞ্চিত হলাম। গাছগাছালির মধ্যে ফল ও ফুলের গাছও রয়েছে। ফল বলতে পেয়ারা, পাহাড়ি নাশপাতি ও কমলালেবু গাছ চেনা গেল। ফুলগুলি সব নাম না জানাই রয়ে গেল।

গাছপালা দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। হঠাৎ চোখে পড়ল দূরে পাহাড়ের গায়ে আগুনের ফুলকি। জানতে পারলাম অনেক সময়ে স্থানীয় লোকজন আগুন লাগিয়ে দেয় বনে, পরে সেখানে চাষ করবে বলে। পদমজীর কাছে শোনা গেল এখানে লেপার্ড ও ভাল্লুকের অস্তিত্ব গ্রামবাসীরা টের পেয়েছে। প্রাণী থাক বা না থাক এখানকার আরণ্যক পরিবেশটি বেশ রহস্যময়, সঙ্গে রোমাঞ্চকর। একটা নির্মল ভাললাগা মন ছুঁয়ে গেল। যেখানে পাহাড়ি নির্জনতা, সাবেকি একটি বনবাংলো, ঢেউ খেলানো পর্বতরাজি, হাঁটা পথে ঘন হয়ে আসা অনাঘ্রাত অরণ্য, অজানা-অচেনা পাখিদের কলকাকলি আর শিরশিরানি হাওয়ায় বিদ্যুৎবিহীন নিশুতি রাত সবমিলিয়ে রহস্যভরা প্রকৃতির ছন্দময় কোলাজ যেন এক মায়াময় জগত গড়ে তোলে। কীভাবে যেন কেটে গেল দুটো দিন। দু'বছর আগেও একবার এসেছিলাম এই আশ্চর্য জগতে। পরদিন খুব ভোরে বেরিয়ে পড়া। সকাল সকাল বিদায় জানাতে চলে এল কালিজ ফেজান্ট দম্পতি। কিন্তু ছবি আর তোলা হল না। এখানে গাছে গাছে নানা পাখির সঙ্গে আছে অবাক পৃথিবী। এখানে দরজায় তালাচাবি দিতে হয় না। অপরিচিত মানুষকে দেখে হেসে এগিয়ে যায় সাহায্যের হাত। সেই হাতছানিই টেনে আনে আমাদের লাটপাঞ্চার।

মাল নদীর চর

রাত তখন গভীর। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নিশ্চয়ই, না হলে জাগলাম কীসের আওয়াজে? দূর থেকে একটা চাপা আওয়াজ আসছে এটা বুঝতে পারলাম তখন। শব্দটা খানিক ট্রাম্পেট-এর মতো। আশা ভোঁসলের গানে অনেক শুনেছি। এই অসময়ে ট্রাম্পেট বাজিয়ে মিউজিক প্র্যাকটিস, সেই সঙ্গে হই হল্লা, এর মানে কী? মানেটা এই রকম দাঁড়ায়, ট্রাম্পেট বাজিয়ে কেউ গান জুড়বার চেষ্টা করছে আর কিছু শ্রোতা তাতে উৎসাহ দিচ্ছে। সেই সঙ্গে খুব কাছ থেকে একটা পেঁচার চ্যাঁচানিও শুনতে পাচ্ছিলাম। ট্রাম্পেট বাজিয়ে লোকটা খুব একটা যে সুরে ছিল না, এটা অতো দূর থেকেই বুঝতে পারছিলাম। ফের ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে ভাবলাম, কী আজব জায়গা রে বাবা!

সকালে ঘুমও ভাঙল তাড়াতাড়ি, আমার পাশের বিছানাতে যিনি শুয়েছিলেন তিনি আমাকে দেখে অবাক, 'সে কি রে! আজ সূর্য উঠবে তো?' আমি অত সকালে কোনওদিনই উঠতে পারি না, এটা উনি জানতেন। বললাম ধুর! রাতে ঘুম হয়নি! কে যেন বেসুরো মিউজিক বাজিয়ে জাগিয়ে দিয়েছিল। ঠিক এই সময় চায়ের তামঝাম নিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকল একটি ছেলে। তাকেই সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাই তোমাদের এখানে রাতে মিউজিক বাজায় কে?' সে বলল, 'ওহ কাল রাতের কথা বলছেন? ও তো হাথির দল এল গ্রামে তাই অতো টিন পেটানো চিৎকার।' 'হাথি'? মানে হাতি এসেছিল গত রাতে? কত দূরে? ছেলেটি বলল, এই তো এক কিলোমিটার। বাবারে এত কাছে হাতির দল? ছেলেটি অবশ্য শান্ত স্বরে বলল, তেমন কোনও ব্যাপার না।

এবার আমরা টিমে চারজন ছিলাম। ঝটপট উঠে পড়লাম বাথরুমের কাজ সেরে তৈরি হয়ে নিলাম। আজ আমরা মাল নদী টি গার্ডেন-এর উপর একটা ডকু ফিচার তৈরি করব, সেই জন্য আমাদের গত রাতে এই মালবাজারে আগমন। এই মাল নদী টি গার্ডেন-এ আমরা অতিথি, গত রাতে তাদের গেস্ট রুমে আমাদের রাত্রিবাস। ড্রাইভার ছেলেটি ঝটপট সব সরঞ্জাম গাড়িতে তুলে ফেলল। আমরা প্রথমেই গেলাম ম্যানেজার বাংলোতে। গেস্ট রুম থেকে বেশি দূরে নয়, তবুও সব লটবহর নিয়ে হেঁটে তো আর যাওয়া যায় না। ম্যানেজার মিস্টার শেখাওয়াত আমাদের চা খাওয়ালেন, প্রাতঃরাশ আমরা গেস্ট রুমে সেরে এসেছি, কাজেই চা খেয়ে উঠে পড়লাম।

প্রথমেই গেলাম চা কী করে তৈরি হয় সেটা দেখতে। ওরে বাবা এ তো এলাহি ব্যাপার, পুঁচকে এক কাপ চা সকাল বিকেল এমনকি মাঝেমধ্যে ভর দুপুরে অনেকেই পান করি। কিন্তু তা তৈরি করা যে এত তুরুম তারাজ ব্যাপার কে জানত? বিরাট বিরাট সব মেশিন, আর প্রচুর লোকজন একই সঙ্গে কাজ করছে। দিনের শুরুতে চা-শ্রমিকরা বাগিচা থেকে একটি কুঁড়ি দুটি পাতা তুলে আনে (যদিও এখন একটি কুঁড়ির সঙ্গে তিন বা চারটে পাতাও তোলা হয়)। তারপরে সেই কাঁচা চা-পাতাগুলোকে জল দিয়ে ধুয়ে একটি বড় পেষাই মেশিনে পিষে মণ্ড বানান হয়। সেই মণ্ডগুলোকে পরে

ওপরে গজাননের পায়ের ছাপ, নীচে আদিম গুহার মুখ

শুকিয়ে ছোট স্তরে ভেঙে ভেঙে চা তৈরি হয়। পুরোটাই বিভিন্ন রকম মেশিন দিয়ে তৈরি হয়। প্রচুর শ্রমিক এই প্রস্তুতিতে কাজ করে থাকে। বিভিন্ন তাপমাত্রায় ভিন্ন রকমের চায়ের ফ্লেভার তৈরি করা হয়। ক্যামেরা অন করে প্রত্যেকটা বিষয়ের ছবি তোলা হল, সেই সঙ্গে চলল প্রশ্ন-উত্তরের পালা। ক্যামেরাবন্দি হল সবকিছু। এবার বেলা বাড়ছে, ম্যানেজার শেখাওয়াত বললেন, চলুন এবার টি গার্ডেনে পাতা তোলা ও আর কিছু বিষয় আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

এরপর ফ্যাক্টরি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চড়লাম। কিছুটা পথ পেরিয়ে হাজির হলাম চা বাগিচার সামনে, মহা উৎসাহে পাতা তোলার কাজ কাজ করতে লাগলেন অনেকেই, আমরাও আবার ক্যামেরাবন্দি করতে লাগলাম। সেই সঙ্গে চলল চায়ের বিষয়ক নানা প্রশ্ন-উত্তর। আর একজন চায়ের বিশেষজ্ঞ চায়ের ছোট চারা থেকে কাটিং, প্রুনিংয়ের ব্যাপারে বিশদে বলে গেলেন। কাজটা ভালই এগচ্ছে, টিমের সবাই বেশ খুশি। ম্যানেজারবাবুও বললেন এই মাল নদীর ইতিহাস, তাও ক্যামেরাবন্দি হল। এবার আবার ফিরব ফ্যাক্টরিতে আর কিছু বিষয়ে জানার আছে, শুধু চা তৈরি নয়, যে সব মানুষ এই চা-বাগানে কাজ করেন, নিত্যদিন যারা এই চা তৈরিতে কাজ করছেন, এদের যাপন চিত্রের হালহকিকৎ এই তথ্যচিত্রে তুলে ধরাই আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল আমাদের। এটাই ছিল ছক তথ্যচিত্রের। বাগিচার কাজ মোটামুটি শেষ, যদি আরও কিছু ফুটেজ লাগে পরে তুলে নব। তথ্যচিত্রে কিছু এক্সট্রা ছবি তুলে রাখতে হয়, কারণ ভাষ্যপাঠে কিছু ছবির দরকার হয়, মানে চায়ের ব্যাপারে বলা ছাড়াও মানুষের জীবন কথা বলার সময় কিছু ছবি লাগে। এবার বেরিয়ে পড়ার পালা বাগান থেকে, এমন সময় আমার চোখ পড়ল একটা গোলাকার ছাপ মাটির ওপর, মাটিটা কিছু নরম বলে অমন একটা ছাপ। সঙ্গে ছিলেন এক শ্রমিক, তাকে বললাম— এই গোল এত বড় ছাপটা কিসের? উনি হেসে বললেন, 'কাল রাতে এই দিক দিয়েই গজানন গেছে ওটা ওর পায়ের ছাপ'। 'গজানন' মানে এটা হাতির পায়ের ছাপ? হাসলেন উনি।

এত বড় পায়ের ছাপ? বড় বলে বড়? সার্কাসে, চিড়িয়াখানায় এবং উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে মাঝেমধ্যে হাতি দেখেছি নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে, কিন্তু বিশ্বাস করুন পায়ের দিকে অত মনযোগ দিয়ে দেখিনি। আর সেটাই চরম ভুল এবার বুঝলাম। পায়ের ছাপ দেখে থাকলে এত চমকাতাম না, একটা মাঝারি মাপের গোল টি টেবিলের সাইজ। তাহলে হাতিটি মানে সেই গজানন কতটা বড়? উচ্চতা কত? আর সেই বেসুরো ট্রাম্পেটের মিউজিকটা ওনারই জন্য সেটাও বুঝলাম। বাকিদের মুখে শুনলাম মাঝেমধ্যে ওনারা আসেন গ্রামে, হাঁড়িয়া খেতে, আর চাল বা ভুট্টা পেলে তো মহাভোজ। এ যেন গব্বর সিংয়ের 'কালিয়া'রা রামগড় লুঠতে এসেছে। একেকটি ছোট দলে ৭-৮টি হাতি থাকে। বাচ্চা হাতিও দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। তবে বিশেষ করে গ্রামে এসে চাল, ভুট্টা ইত্যাদি ঘর ভেঙে লুঠ করে একটা বা দুটো দলছুট হাতি । সব হাতি তো আর গুন্ডা টাইপ হয় না। বেকার

সবগুলোর নামে বদনাম। তাৎক্ষণিক বুদ্ধি ওদের মানুষের চেয়ে কম কিছু নেই। আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক একটা গল্প বলেছিলেন। কাজের সূত্রে তখন তিনি কালিম্পঙে ছিলেন। সকাল সকাল প্রকৃতির ডাকে লেবাররা তিস্তা নদীর পাশে প্রাতঃক্রিয়া সারছিল। ঠিক তখনই হঠাৎ এক লেবারকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে এক হস্তিনি নিয়ে চলল এক নালার উদ্দেশে। সবাই ভাবল, সরকার বাহাদুর নির্মল ভারত গড়ার কাজে এখন বুঝি হাতি রেখেছেন! ঘরে শৌচালয় না বানালে, মাঠেঘাটে গেলে সোজা হাতি দিয়ে অ্যারেস্ট? লোকটি হাউমাউ করেই যাচ্ছে কিন্তু হাতি চটজলদি নালার পাশে লোকটিকে নামিয়ে দিল। এবার আসল ব্যাপার বোঝা গেল, গভীর নালার ভেতর একটা ছোট হাতির বাচ্চা পড়ে গিয়েছে। হাতিটির আবেদন বাচ্চাটাকে তুলে দাও। লোকজন মহা উৎসাহে বাচ্চাটিকে তুলে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিল। মা হাতি তাদের থ্যাংকস দিয়েছিল কি না তা অবশ্য জানা যায় নি। উফ্ হাতি প্রাণীটা এত বড় যে শেষ হতেই চায় না।

গাড়িতেও ওই একই আলোচনা চলল। একটু পরে আমরা আবার চা প্রস্তুতিকরণ বিভাগে ঢুকলাম। এবার চা-শ্রমিকদের যাপনচিত্র ক্যামেরাবন্দি হচ্ছে। এবার একটা দারুণ জিনিস দেখলাম, মহিলা চা শ্রমিকদের

❝ এত বড় পায়ের ছাপ? বড় বলে বড়? সার্কাসে, চিড়িয়াখানায় এবং উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে মাঝেমধ্যে হাতি দেখেছি নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে, কিন্তু বিশ্বাস করুন পায়ের দিকে অত মনযোগ দিয়ে দেখিনি। আর সেটাই চরম ভুল এবার বুঝলাম। পায়ের ছাপ দেখে থাকলে এত চমকাতাম না, একটা মাঝারি মাপের গোল টি টেবিলের সাইজ। তাহলে হাতিটি মানে সেই গজানন কতটা বড়? উচ্চতা কত? ❞

বাচ্চাদের রাখার জায়গা। আমাদের শহরের আধুনিক ক্রেশগুলোর মতো না হলেও ক্রেশ কনসেপ্টটা আছে ওখানে। শ্রমিকরা কাজে গেলে ছোট্ট বাচ্চাদের দেখভাল করা। হঠাৎ একটা সাইরেনের শব্দে তন্ময় হয়ে থাকাটা চটকে গেল। পাতা তোলা শেষ, শ্রমিকরা পাতা জমা করে মজুরি নেবে এবার। 'সাইরেন', তার মানে ফিরে এস বাগিচা থেকে। আমরাও চটপট ক্যামেরা নিয়ে তৈরি হলাম। একে একে মজুরির হিসেব খাতা থেকে, শ্রমিকদের বিকেলের রোদে স্নাত, ক্লান্ত তবে হাসিমাখা মুখের ছবি দারুণ সব অ্যাঙ্গেলে তোলা হল। কিছু কথপোকথনও হল শ্রমিকদের সঙ্গে। একটা অধ্যায় শেষ। মিস্টার শেখওয়াত তাড়া লাগালেন লাঞ্চের জন্য, এত কর্মকাণ্ডে ভুলেই গিয়েছিলাম খিদের কথা। মনে করাতেই ইঁদুর দৌড়ও শেষ, টের পেলাম পেট বলে কিছু নেই। এত খিদে নিয়ে বসলাম, খাবার অতি চমৎকার তবে বেশি খেতে পারলাম না। চিকেন আর ভাত সঙ্গে স্যালাড খেয়ে উঠে পড়লাম।

ম্যানেজারের চেম্বারে বসে গল্প হচ্ছিল। চা তৈরিতে অনেক পুরস্কারও পেয়েছে মাল নদী চা-বাগান, সেই সব শিল্ডও দেখালেন সঙ্গে অনেক শংসাপত্রও। এবার ম্যানেজার সাহেব ফাঁদলেন আরেক গল্প। এখানে নাকি আর একটা দেখার জিনিস আছে। সারপ্রাইজ, আবারও গাড়িতে চড়ে বসলাম। গাড়ি বন্ধুর পথ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এ পথে গাড়ি চলাচল সম্ভব নয় বলেই মনে হল। গাড়ির চালকটি অবশ্য দুর্দান্ত কায়দা করে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। একবার তাকে এক ঝলক দেখে মনে হল রেসিং কার-এ মাইকেল শুমাখারের সঙ্গে বসে আছি। কিংবা কার বেশ খানিকক্ষণ চলবার পরে শেষমেশ একটা জায়গায় এসে থামলাম। নেমে গায়ে একটু ব্যথা হচ্ছিল বটে কিন্তু সারপ্রাইজের উত্তেজনায় সেগুলোকে পাত্তা দিলাম না। কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে কিছুটা নিচু জমিতে নেমে গেলাম। আশপাশ ঘন ঝোপে ঢাকা। দেখে মনে হয় কেউ যেন আড়াল থেকে দেখছে। আলো কমে এসেছে তবুও টুকটাক ছবি তোলা হচ্ছিল। ক্যামেরার এক্সপোজার কিছুটা বাড়িয়ে নিয়ে। অনেকটা অসমতল জায়গা, পাহাড় কেটে কেটে চলার পথ করা হয়েছে। পায়ের নীচে শুধুই নাম না জানা ঝোপঝাড়, তার মধ্যেও একটা সরু নালা বয়ে চলেছে। বুনো ফুলের গন্ধে চারপাশ ম ম করছে। হাল্কা ঠান্ডা হাওয়া আলতো পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। মনে মনে বললাম, সুইজারল্যান্ড যেতে হবে না, একবার ভাল করে ডুয়ার্স ঘুরে যান। কী নেই এখানে? সামনেই পাহাড়, ঝরনা, জঙ্গল, তাতে রয়েছে হাতি, লেপার্ড, গন্ডার, কত রকমের পাখি। আমরা খুব দেখেশুনে একটা সমতল জায়গায় এলাম।

ওরে বাবা, এবার সামনেই দেখি এক গুহা। এ তো অরণ্যদেবের সেই খুলি গুহা! খুলির মতো আদল না হলেও ঝোপঝাড়ে ঢাকা এক গুহামুখ। একটু উঁচুতে চড়ে বসলাম গুহা মুখে। অতি প্রাচীন এক বটের ঝুড়ি দিয়ে গোটা গুহামুখ জড়িয়ে আছে। পরে শ্রমিকদের মধ্যে দু' একজন বলেছিল, অনেক আগে একবার তারা ভেতরে ঢুকেছিল, তখন কিছু অস্ত্রশস্ত্র দেখতে পায়। আর ভেতরটা নাকি গোল মতো একটা হলঘরের আকারের। গুহামুখ খুব ছোট হওয়ায় এখন আর মানুষের প্রবেশ সম্ভব নয়। খুব ইচ্ছে ছিল ভেতরে যাওয়ার, না জানি আরও কী দেখতে পাওয়া যেত! এই গুহাপথেই কি পৌঁছনো যায় আরও কোনও গভীরে? বা পাহাড়ের অন্য কোনও

প্রান্তে? চারদিক জুড়ে অবাক নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়ে তখন দিনের আলো দ্রুত কমে আসছিল। মাঝে মাঝে কেবল কানে আসছিল কোনও নাম না জানা পাখির ডাক। সে এক ছমছমে রোমাঞ্চকর আরণ্যকপরিবেশ। মনে হচ্ছিল যেন এক অদৃশ্য টাইম মেশিনে চেপে বসেছি ক'জন, পৌঁছে গিয়েছি বহু বছর পেছনে। আমরাই কি তবে এই আদিম গুহার আবিষ্কারক? সেই রাখাল ছেলেটির মতো? যে তার হারিয়ে যাওয়া বাছুরের খোঁজ করতে গিয়ে আবিষ্কার করে ফেলেছিল কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন গুহা?

সবার উত্তেজনা তখন তুঙ্গে বলাই বাহুল্য। ম্যানেজার সাহেব কেবল মিটিমিটি হাসছিলেন। এই অসামান্য সারপ্রাইজের জন্য মিস্টার শেখাওয়াতকে সবাই অনেক থ্যাংকস জানালাম। এবার ফেরার পালা, বাঙালিও তার আসল রূপে এল, শুরু হল জোর বিতর্ক। গুহাটি কি ইংরেজদের হাত থেকে আত্মগোপনের জন্য বিপ্লবীদের তৈরি? আরেক জন বলে উঠল, আরে ধুর এই গুহা আসলে দেবী চৌধুরানি বানিয়েছিলেন গোপন আস্তানা হিসেবে। কেউ বলল, জঙ্গিদের জন্য এ এক আদর্শ জায়গা। সে যার জন্যই তৈরি হোক না কেন গুহা, তর্কও চলবে, কিন্তু পাগল করা এক অনুভূতি নিয়ে ফিরে সেদিন সন্ধেবেলায় আবার সাঁওতালি নাচও দেখেছিলাম।

লেখা ও ছবি - দেবরাজ কর

মৃত্যু পথে জলপাইগুড়ির একদা অভিজাত ক্লাব

ভেন্টিলেশন থেকে কি ফিরবে?

উত্তরপক্ষ

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

জলপাইগুড়ি ইউরোপিয়ান ক্লাব ছিল তার পুরনো নাম। ইউরোপিয়ানরা নিজেদের মধ্যে মেলামেশা ও বিনোদনের জন্য দ্বিতল ক্লাবটি গড়ে তোলেন ১৮৯৪ সালে, শহরের প্রান্তে। তখন চা বাগানের ম্যানেজাররা অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গ, ভিনদেশি। সারা ডুয়ার্স জুড়ে গড়ে উঠেছিল চা বাগানের পদস্থচাকুরেদের জন্য অনেকগুলো ক্লাব। এগুলির মধ্যে মাল, বিন্নাগুড়ি, নাগরাকাটা এবং জলপাইগুড়ির ইউরোপিয়ান ক্লাব ছিল খুব নামকরা। ব্রিটিশ শাসনকালে মুষ্টিমেয় স্থানীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের কিছু নাগরিক নিজেদের স্বার্থে ক্লাবের সদস্য হয়েছিলেন। ব্রিটিশদের তাবেদারির পুরস্কার অনেককে আখের গুছিয়ে নিতে সাহায্য করেছিল।

মদিরা পান কক্ষ

গত শতকের ষাট দশকের প্রথম দিকে আমার বাবা বাগরাকোট চা বাগানের সাওগা ডিভিশনে চাকুরি করতেন। ম্যাকানজি সাহেব তখন বাগরাকোটের ডাকসাইটে ম্যানেজার, শিকার করা তাঁর নেশা ছিল। এক শনিবার রাতে বাবা জলপাইগুড়ির ভাড়া বাড়িতে আমাদের দেখতে এসে বলেছিলেন, ম্যাকানজি সাহেব সেদিন জলপাইগুড়িতে এসেছেন আর তিনি রাতে ইউরোপিয়ান ক্লাবে থাকবেন। তখন ভেবেছিলাম, ক্লাবে আবার মানুষ থাকে নাকি?

আজকের প্রবীণদের অনেকের হয়ত মনে আছে, কী বিশাল এলাকা জুড়ে ক্লাবটি গড়ে উঠেছিল। শুরুতে ছিল ১৩.৯৪ একর জমি। জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক ৩০.০১.২০০৯ তারিখের পত্র মারফত জানান যে আসল লিজ ডিড অনুসারে ১১.৭৭ একর জমির লিজ ০২.০৮.১৯৫৭ তারিখ পর্যন্ত আইনানুগভাবে সিদ্ধ ছিল। ক্লাবের সেই জমি দখল তখন থেকেই চালু ছিল। একই চিঠিতে রাজ্য সরকার লিখছে, প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ওই সময়ে ৫.৪৫ একর জমি ক্লাবের লিজভূক্ত ছিল, বি.এল.এল.আর.-ও কে বলা হল সরেজমিনে অবস্থা দেখে জানাতে যাতে রিনিউয়াল করা সম্ভব হয়। দেখা গেল সেচদপ্তরে ৪.০৪০ একর, পোস্টাল দপ্তরে ১.৪৪৮ একর ও ১.৬৪০ একর এবং পিডি কলেজের দখলে ১.০৪০ একর জমি চলে গেছে। শুধুমাত্র সরকারি দপ্তরের কাছ থেকেই বিপুল পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ বাবদ ক্লাবের প্রাপ্য ছিল। শহরের প্রাচীন এই হেরিটেজ বাড়িটিকে এবং যে কিঞ্চিৎ পরিমাণ জমি-জায়গা এখনও ক্লাবের দখলে আছে তার ওই টাকাতেই সংরক্ষণ করা বা দৃষ্টিনন্দন চেহরা প্রদান করা সম্ভব হত।

আমরা কিশোরকালে দেখেছি শহরের কিছু শক্ত সমর্থ বনেদি মানুষ বিকেলে সাদা হাফ প্যান্ট ও সাদা টি শার্ট পরে, কেউ বা টুপি লাগিয়ে সাইকেলে চেপে ইউরোপিয়ান ক্লাবের পথে লন টেনিস খেলতে চলেছেন। তখন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মাঠ ও ইউরোপিয়ান ক্লাবের মাঠ, এই দুই মাঠে টেনিস খেলা হত। ছেলেবেলায় আমাকে কিং সাহেবের ঘাটের সরু লোহার ব্রিজ দারুণ আকর্ষণ করত। করলা নদীর দুই পারে সেকালে কচিৎ প্রেমিক-প্রেমিকাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। যদিও এলাকাটা সেকাল থেকেই প্রেম পার্বণের জন্য পরিচিত ছিল। কখনও ওই এলাকায় বেড়াতে গেলে দূর থেকে কিছু মানুষকে টেনিস খেলতে দেখেছি। তবে এটা জানতাম ক্লাবে শহরের অভিজাত সুরা রসিকগণ সন্ধ্যাকালে পান-ভোজন আর আড্ডায় সময় যাপন করতেন। কাজেই এ এলাকায় তরুণ বা কিশোরদের একেবারে প্রবেশাধিকার ছিল না। ক্লাবের বাই ল-র দশম অনুচ্ছেদ বলছে ২০ বছরের কমবয়সী কোনও ব্যক্তিকে সদস্য পদ দেওয়া হত না।

গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সেচ দপ্তরে চাকরির কারণে ক্লাবের বিপরীতে আমাদের অফিস থাকায় খুব কাছ থেকে ক্লাবকে লক্ষ্য করতাম। আমার বন্ধু বাসুর অফিস একসময় ক্লাবের নিচ তলার এক অংশে বেশ কিছুদিন ভাড়া নিয়ে চলত। আড্ডা মারতে বাসুর অফিসে প্রায়ই যেতাম। তখন উপরতলা বাসযোগ্য ছিল। ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দল একবার এসে ক্লাবে উঠেছিল। উপরের ব্যালকনিতে ওরা জমিয়ে আড্ডা মারছিল। গৌতম, পিন্টুরা লাগাতার অটোগ্রাফ বিলি করছিল। সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহকে একদিন ক্লাবে দেখেছি হাতে গ্লাস নিয়ে গুনগুন করে গান গাইছেন। বহু মরমী মানুষ এখানে এসেছেন। সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার

> ‘সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহকে একদিন ক্লাবে দেখেছি হাতে গ্লাস নিয়ে গুনগুন করে গান গাইছেন। বহু মরমী মানুষ এখানে এসেছেন। সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার এখানে আড্ডা মেরে গেছেন। আমাদের আর এক বন্ধু গৌতম ঘোষ কিছুদিন সপরিবারে ক্লাবের দোতলায় ডানদিকের স্যুটটি ভাড়া নিয়ে বসবাস করেছিল।’

শতাব্দী প্রাচীন জলপাইগুড়ি ইউরোপিয়ান ক্লাব

এখানে আড্ডা মেরে গেছেন। আমাদের আর এক বন্ধু গৌতম ঘোষ কিছুদিন সপরিবারে ক্লাবের দোতলায় ডান দিকের স্যুটটি ভাড়া নিয়ে বসবাস করেছিল। ঘরটিতে আমরা প্রচুর হৈ হুল্লোড় করেছি। সে সময় আমাদের বন্ধুকুলে কল্যাণ, বাপি, সলিল, বুবুনরা ক্লাবের সদস্য ছিল। আমরা কয়েকজন বেশ কিছু পরে সদস্য হয়েছি। আড্ডা মারার জন্য এমন বনেদি পরিকাঠামো জলপাইগুড়ি শহরে দুটি নেই।

পেশাগত কারণে বহুবার ডিসিসি মিটিং-এ ক্লাবের হল ঘরে হাজির থেকেছি, জেলা শাসকের পৌরহিত্যে ওরকম মিটিং এখনও নিয়মিত হয়ে থাকে। তবে জলপাইগুড়ি ক্লাবে আর সেই মিটিং অনুষ্ঠিত হয় না। জলপাইগুড়ির তৎকালীন জেলা শাসক সুনীল মিত্র যখন বদলি হলেন তখন ক্লাবে একটা বড় পার্টি কাম মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। স্টার্টারই ছিল প্রায় দশ পদ। ঢেল ও কবীর দুই বাবুর্চি মিলে সাত ঘণ্টা ধরে যে বিরিয়ানি রান্না করেছিলেন তা ভোজন রসিকরা কখনই ভুলবেন না। আর রঙিন জলের ফোয়ারায় যারা সেদিন বেহেড হয়ে গেলেন তাঁদের নাম বলা ঠিক হবে না। লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার ছিলেন দেবব্রত ঘোষ, তাঁর মতো ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট বিশারদ কদাচিৎ চোখে পড়ে। এমন একটা পরিবেশে তিনি ডিসিসি মিটিং- টাও সেরে ফেললেন। এক সময় ক্লাবের কিচেনটির বেশ নাম ডাক ছিল। চিকেন কাটলেট, মাটন কসা, পুডিং বেশ জনপ্রিয় আইটেম ছিল। ৩১শে ডিসেম্বর রাতে হাউসি খেলার পর ডিনার জমজমাট হত। কুক ও তাঁদের সহকারিদের অভিজ্ঞতা প্রচুর। পোরসিলিন ক্রকারিজ বেশ শৌখিন ছিল। পরিবেশনের আর্ট তারা জানতেন।

দোতলার বাম দিকে একটি ঘরে গত প্রায় কুড়ি বছর ধরে বাস করেন শিল্পী নীহার মজুমদার। তাঁর স্টুডিও ছিল ওই ঘরে। জীর্ণ, অবহেলায় হতশ্রী বসবাসের অযোগ্য বাড়িটি। অথচ কোনও একদিন বাড়িটির মহার্ঘ কাঠের মেঝেতে জুতোর হিলের দাপটে ঝড় তুলতেন টেমস নদীর ধারে লালিত ব্রিটিশ কন্যার দল। সুদৃশ্য ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি, ছাতা বা টুপি ঝুলিয়ে রাখার মেহগিনি কাঠের পালিশ করা স্ট্যান্ড, বেলজিয়ান গ্লাসের ড্রেসিং ফ্রেম, পেল্লায় বিলিয়ার্ড বোর্ড, কিছু পুরনো আসবাব মনে করিয়ে দেয় কারা এই ক্লাবের সদস্য ছিল একদিন। কারন সুধা পানের টেবিলগুলোর কোণাগুলো

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch
(Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC	Rs. 650	900
Deluxe AC	Rs. 990	1200
Super Deluxe AC	Rs. 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs. 2000	2000
Suite	Rs. 3000	3000
VIP Suite	Rs. 3500	3500
Extra Occupancy (N-AC)	Rs. 100	--
Extra Occupancy (SC)	Rs. 200	--

N.B. *Tax as per applicable*

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar
Tel. No. +91 9735526252, (03582) 227885/231710
Email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubrajcoochbehar.com

পানপাত্র রাখার জন্য গোল করে কাটা। দক্ষিণের বড় হলঘরের কাচবিহীন জানালা রাতে খুলতেই পাশের ফার্নের জঙ্গলে অসংখ্য জোনাকির মিছিল দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ১২৫ বছর হতে চলেছে ক্লাবের বয়স, অথচ কোনও উদ্‌যাপনের আয়োজন শুরু হয়নি।

এই ক্লাবের সঙ্গে অনেক প্রবীণ নাগরিকদের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। বাড়িটির দেওয়ালে এখন বট পাকুড়ের গাছ গজিয়ে উঠেছে, প্রাচীন ২০-২৫ ইঞ্চির দেওয়াল ফাটিয়ে গাছগুলো আকাশমুখী। দোতলার চাল, সিলিং জীর্ণ। বর্ষায় উপরতলায় অনেক অংশে জল থৈথৈ করে। এমনকি কখনও বা চুঁইয়ে চুঁইয়ে সেই জল নিচের তলায় মৌতাতে বিঘ্ন ঘটায়। আনাচকানাচে বড় বড় সাপ ঘুরে বেড়ায়। এককালে রাতে এই অঞ্চলে শেয়ালদের পার্লামেন্ট বসত। পাশের ফার্ন গাছের জঙ্গলে ছিল ওদের দীর্ঘ দিনের আস্তানা। নগরায়নের সাথে বাস্তুচ্যুত হয়েছে সেই সব শেয়ালেরা, ভাম দু'-চারটে আছে, নেই বেজির দল, নেই নানা প্রজাতির পাখি।

শোনা যায় দু'-একবার জেলাশাসক নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে নামকরা কিছু কর্পোরেট হাউসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন যাতে কিছুটা সংস্কারের কাজ করা সম্ভব হয়। বিনিময়ে সেই হাউসগুলো তাদের পরিচিতি দিয়ে বোর্ড ঝোলাতে চেয়েছিলেন, তাতে তৎকালীন ক্লাব কর্তৃপক্ষ নাকি সম্মত হননি। বর্তমানে ক্লাবের আর্থিক সঙ্গতি তলানিতে, কাজেই তাঁরা নিজেরাই সংস্কারের ব্যয়ভার বহন করবেন এমন চিন্তা প্রশ্রয় না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ক্লাবের সবচেয়ে ভরসার স্থল ছিল চা-করগণ, তাঁদের বেশির ভাগই অস্তিত্বের সংকটে ভুগছেন। তার মানে কি এই হেরিটেজ প্রতিষ্ঠান তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে যাবে? শুনেছি রাজ্য হেরিটেজ কমিশন নাকি একসময় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের কথা ভাবনাচিন্তা করছিলেন। তারপর আবার সেই অনন্ত স্তব্ধতা। উত্তরবঙ্গের মানুষজন কেন নিজেদের বঞ্চিত অবহেলিত ভাববেন না বলুন তো? কবে বাড়িটি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে, আর চিরতরে হারিয়ে যাবে শতাব্দী প্রাচীন নানা ইতিহাসের সাক্ষী ইউরোপিয়ান ক্লাব, সেই অপেক্ষাতেই কি রয়েছি আমরা? এটা যে একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না!

নোংরা আবরণে ঢাকা বিলিয়ার্ড বোর্ড

দোতলায় ওঠার মূল্যবান কাঠের সিঁড়ি

> কোনও একদিন বাড়িটির মহার্ঘ কাঠের মেঝেতে জুতোর হিলের দাপটে ঝড় তুলতেন টেমস নদীর ধারে লালিত বৃটিশ কন্যার দল। সুদৃশ্য ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি, ছাতা বা টুপি ঝুলিয়ে রাখার মেহগিনি কাঠের পালিশ করা স্ট্যান্ড, বেলজিয়ান গ্লাসের ড্রেসিং ফ্রেম, পেল্লায় বিলিয়ার্ড বোর্ড, কিছু পুরনো আসবাব মনে করিয়ে দেয় কারা এই ক্লাবের সদস্য ছিল একদিন।

১৬ই অক্টোবর ২০০৭ সনে ক্লাব কর্তৃপক্ষ জলপাইগুড়ির জেলা শাসককে চিঠি দিয়ে লিজের মেয়াদ বৃদ্ধির কথা, আর্থিক দূরাবস্থার কথা এবং প্রকারন্তরে দখলচ্যুত জমির ক্ষতিপূরণের কথাও বলেছিলেন। ০২.১১.১৯৮৫ তারিখের চিঠিতে 'বোর্ড অব রেভেনিউ' জেলা কর্তৃপক্ষকে লিজ রিনিউ করতে এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ দিতে নির্দেশ জারি করে। ২০০২ সনে সার্কিট বেঞ্চের ধুয়ো তুলে আবগারি দপ্তর ক্লাবে মদ বিক্রির লাইসেন্স বাতিল করে। তারপর ক্লাব মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়, হাইকোর্ট ক্লাবের পক্ষে রায় দান করে। জলপাইগুড়ি ডিভিশনের কমিশনার জলপাইগুড়ির আবগারি দপ্তরকে লাইসেন্স ইস্যু করতে এবং জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরকে ক্লাবের জমির লিজ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেন। শাশ্বত রেওয়াজ মেনে দিস্তা দিস্তা কাগজে চিঠি চালাচালি চলছে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে, কিন্তু এখনও গড়িমসি চলছে। লিজের ব্যাপারটা বর্তমানে ঠিক কোন পর্যায়ে দাড়িয়ে আছে সেটা আমাদের কারও কাছে পরিষ্কার নয়।

১৭ই আগষ্ট ১৯৬২ তারিখে ক্লাবের বাই-ল গৃহীত হওয়ার সময়, মাসিক সদস্য চাঁদার নানা রকম ফের ছিল। তখন ভর্তি ফি ছিল ১৫ টাকা আর মাসিক চাঁদা ছিল ৫ টাকা। বর্তমানে মাসিক চাঁদা ২০০ টাকা, এটাও বাড়ার কথা। এই চাঁদা বাড়ানো হয় কমিটির আভ্যন্তরীণ আলোচনায়, তারপর নোটিশ জারি করা হয়। এবার আর্থিক সংকট মোকাবিলার তাগিদে সাধারণ সদস্যদের নিয়ে মিটিং করা হয়েছিল। এমন আলোচনা মাঝে মাঝে হলে হয়ত ক্লাবের সদস্যরা একাত্মতা বোধ করতে পারেন। বন্ধু দেবপ্রসাদ রায় এই ক্লাবকে নিয়ে লিখতে উৎসাহিত করেছেন, তথ্য জুগিয়েছেন। সুব্রত সেনগুপ্ত আমাকে কেবল গঠনমূলক কথা লিখতে বলেছিলেন, সে উপদেশ আমি পালন করতে পারিনি। তবে সদস্যরা চান 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকা যেন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বিশেষ করে হেরিটেজ কমিশন যেন প্রাচীন ক্লাবটিকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে। ক্লাবের সম্পত্তি রক্ষায় সবাই আমরা সাহায্য চাই। অসাধু প্রমোটারের হাতে যেন এই একদা অভিজাত ক্লাবের মৃত্যু না হয়। অনেক কথাই আজ বলা হল না, আগামীর জন্য তোলা রইল।

শালবনে রক্তের দাগ

শরীর অনেক দিন উপোষ করে ছিল। রুক্মিনী বলেছিল, আমি ‘নটি’। কিন্তু আমার অনুমতি না নিয়ে আমার পুকুরে অস্ত্র লুকিয়ে রাখাটা পছন্দ হয় নি। একটা সুক্ষ্ম জাল আমার চারপাশে কাজ করছে টের পাই। আমি গুপ্ত কুঠুরির ছোট্ট দরজা খুলে দেখলাম রুক্মিনী আর সত্যমকে। শিলিগুড়ির নার্সিং হোমে নিয়ে গেলাম, কিন্তু সেখানে ডাক্তার বলল, সত্যম মরে গেছে। অ্যাক্সিডেন্ট? বাড়িতে ফিরে কবিতা পড়তে ইচ্ছে হলো আমার। মেয়েটা আমার জীবনের শেষ শত্রু। —তারপর? **সাগরিকা রায়ের** ধারাবাহিক থ্রিলার।

৩১

আলিপুরদুয়ারে ফিরে এসেছি। ইন্সট্রাগ্রামে ক'টা ফটো শেয়ার করলাম। ডিভিডি বের করে মুভি বেছে রাখছিলাম। পরপর ক'টা রাতের খোরাক জোগাড় করে রাখি এভাবে। ভয়ঙ্কর সব থ্রিলার। হাড় হিম হয়ে যায়। নতুন কিছু আনতে হবে। আমার পরিচিত বিন্দুর ভাই সিন্ধুর সাইবার কাফের একটা অংশে ডিভিডি রাখে। আলাদা পার্ট রেখেছে। নাম থ্রিলড স্টোর। ওখানে লেটেস্ট থ্রিলার পাওয়া যায়। দু' ভাইই আমাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে। আজ রাত হয়েছে। কাল গিয়ে বেশ কটা নতুন মুভি নিয়ে আসব। বৃষ্টিঝরা রাতে প্রোজেক্টর চালিয়ে মুভি যে না দেখেছে, সে জানেই না মুভি দেখার আনন্দ কী! বিশেষ করে সেটা যদি হয় থ্রিলার। হু হু উউগলায় সুর খেলছে। কাল বা পরশু একবার নিখিলের বাড়িতে যাব। শুনলাম ওর বাবা নাকি হাট করতে গিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে! কোনও খোঁজ নেই! গত কাল এসে পৌঁছেছি, গাড়ি গ্যারেজ করছি, অমনি দুটো লোক এসে হাজির। গ্রামের লোক। বেশভূষায় সেটাই মনে হল। আর সেটাই স্বাভাবিক। খবর দিল নিখিলের বাপ কোথায় চলে গেছে! চারদিন হল, কোনও খবর নেই!

> অনেক দূর থেকে ছবি তোলা হয়েছে, কিন্তু কেমন আবছা মনে হচ্ছে জায়গাটা আমার যেন চেনা! কিন্তু আমি এসব ভাবছি কেন? প্রত্যেক নদী, মাঠ, বনের আলাদা চেহারা আছে। আলাদা চরিত্র আছে। এই বনের গাম্ভীর্য একটু বেশিই যেন। সঙ্গে থমথমে ভাব। একটা খুন হওয়ার আগে সে জায়গার পরিবেশ যেমন শান্ত, থমথমে হয়ে যায়, বনটা দেখে ঠিক তেমনই অনুভব হচ্ছে! হালকা হয়ে রক্তের গন্ধ ভেসে আসছে এই ঘরে।

আমি কেবল এসেছি, কাজেই আমি এ ব্যাপারে পরে ওদের বাড়িতে গিয়ে কথা বলব। তো কাল যাব ভেবে রেখেছি। নিখিল এখন আমাকেও পাত্তা দেয় না। বেটা লায়েক হয়ে গেছে। কী আর করা যাবে! মায়া ফোন করে? ওহো, ওদের তো আবার ফোন নেই! তাছাড়া নিখিলের মা ফোন ধরার কায়দা জানে না। বেশ, আমি ফোন করে কথা বলিয়ে দেব না হয়।

একটা রিহার্স করা আছে। দেখা যাক।

বেশ উত্তেজক মুভি খুঁজতে গিয়ে গয়েরকাটায় বুক সেলফে পাওয়া ডিভিডিটা হাতে এল। হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলাম। এই ডিভিডিটা নিয়ে আমার অস্বস্তি আছে। কেমন খিচখিচ করে মনটা। একটা ভয় হয়। কী আছে এতে! কেনই বা এটা আমার বাড়িতে রেখে এসেছে মেয়েটা? এমন জায়গায় রেখেছে, যাতে

আমার চোখে পড়ে। এই বিশেষ ব্যাপারটাই আমাকে অস্বস্তিতে রাখে। হাতে নিয়ে দেখলাম। একটা লাল কালির প্লাস চিহ্ন ডিভিডির ওপর। কেন? বিশেষ একজনের জন্য রেডি করা হয়েছে এটা? এই বিশেষ একজন কি আমি? দেখতে হচ্ছেই এটাই কী এমন আছে। আমার প্রোজেক্টর রুমে চলে গেলাম। সব সেট করে, সাদা চাদর টাঙিয়ে বসলাম। বাঁ দিকে একটা স্ট্যান্ডের ওপর প্রোজেক্টর রেখে পাশে চেয়ার টেনে বসেছি। অন্ধকার করে দিয়েছি ঘর। ডিভিডি পুশ করে অপেক্ষা করছি। আস্তে আস্তে ডিভিডি অন হচ্ছে। একটা ফরেস্ট ...মনে হচ্ছে! হুম ...ঘন জঙ্গল, বিশাল বিশাল গাছ। দুর্ভেদ্য যেন! প্রাচীন লতা গুল্ময় আচ্ছন্ন! এক জায়গায় খানিকটা জল জমে আছে ...জলের ওপর দিয়ে ক্যামেরা ঘন বনের দিকে যাচ্ছে...। এটা কি সিনেমা? সাউন্ড সিস্টেম বেশ ভাল। পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছি। ক্যামেরাম্যান কি কোনও আড়াল থেকে ছবি তুলেছে? ক্যামেরা খুব নড়ছে। অসম্ভব নির্জন ফরেস্ট। ঝিঁঝির ঝি ঝি ঝি ঝি ডাকে আরও নিথর, আরও থমথমে পরিবেশ! কোথাও কেউ নেই! একমাত্র ক্যামেরা হাতে লোকটি ছাড়া দ্বিতীয় জনের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে না। খুব ঘন বন। একটা বিরাট মরা গাছ হাত পা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। গাছটার শুকনো ডালে সবুজের চিহ্ন নেই। কেমন খা খা করছে গাছটা। ক্যামেরা এক জায়গায় স্থির হয়ে গেল। লেন্সের সামনে মোটা লতার নড়াচড়া! জঙ্গলের ভেতরে লুকিয়ে আছে ক্যামেরাম্যান! কাকে ফলো করছে লোকটা?

একটা জিনিস পরিষ্কার। ক্যামেরা নিয়ে লোকটা কাউকে ফলো করছিল। ক্যামেরা অপটু হাতে নড়াচড়া করছে। না, এমন হতে পারে ওর ট্রাইপড নেই! জঙ্গলে যেভাবে ক্যামেরাটা হাঁটছে, তাতে ও একচুয়ালি কিসের ছবি তুলতে চায় বোঝা যাচ্ছে না। কখনও আকাশের মেঘ ছুঁয়ে ফের মাটিতে নেমে আসছে ক্যামেরা। জঙ্গলের মধ্যে ক্যামেরাটা স্পাইং করছে কি? এটা কি আমার চেনা কোনও জায়গা! অনেক দূর থেকে ছবি তোলা হয়েছে, কিন্তু কেমন আবছা মনে হচ্ছে জায়গাটা আমার যেন চেনা! কিন্তু আমি এসব ভাবছি কেন? যে কোনও ফরেস্টের চেহারা তো একই রকম হয়! না, এটা বোধহয় ঠিক বললাম না। প্রত্যেক নদী, মাঠ, বনের আলাদা চেহারা আছে। আলাদা চরিত্র আছে। এই বনের গাম্ভীর্য একটু বেশিই যেন। সঙ্গে থমথমে ভাব। একটা খুন হওয়ার আগে সে জায়গার পরিবেশ যেমন শান্ত, থমথমে হয়ে যায়, বনটা দেখে ঠিক তেমনই অনুভব হচ্ছে! হালকা হয়ে রক্তের গন্ধ ভেসে আসছে এই ঘরে। মন অস্থির হয়ে উঠছে নিজের অজান্তে। কী আছে এই ডিভিডিতে! কী হয়েছিল এই বনে! কেনই বা আমার বাড়িতে এটা রেখে দিয়ে এসেছিল সেই মেয়েটা? অবশ্যই মেয়েটা এই কাজ করেছিল। সব ধাঁধা যেন! সব ধাঁধা! মেয়েটা ঝট করে আসে, ঝট করেই হাওয়া হয়ে যায়! আমি খুঁজেই পেলাম না আর ওকে!

আস্তে আস্তে একটা ফাঁকা সমতল জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল ক্যামেরা। একটা গাড়ির একটু অংশ দেখতে পাচ্ছি। গাড়িটা টাটা সুমো কি! পুরো বোঝা যাচ্ছে না! ছবি জুম করা হয়েছে। একটা লোকের পেছনটা দেখতে পাচ্ছি। কী করছে লোকটা ওখানে? এই লোকটাকে ফলো করছে কি ক্যামেরা? নাকি একটা পিকনিক পার্টি জঙ্গলে এসেছে? না, ছবির ফ্রেমিং অন্য গন্ধ দিচ্ছে আমাকে। খানিকটা জায়গা সাফ করা আছে। বেশির ভাগ গাছ আছে দূরে দূরে। মাটির ঘাস গোড়ালি ডুবে যাওয়া। ক্যামেরা ক্লোজে আনছে ছবি। একটা গাছের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। গাছের সঙ্গে ...একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে গাছে হেলান দিয়ে। লোকটার হাত দুটো পেছনে... বাঁধা নাকি? কে? কে লোকটা? ক্যামেরা জুম করে ধরছে লোকটাকে। ভয়ার্ত মুখে তাকিয়ে আছে লোকটা।

আশ্চর্য তো! একটা লোককে জঙ্গলে বেঁধে রাখা হয়েছে। কে এভাবে বেঁধে রেখেছে লোকটাকে? আর লোকটা কে? একটা লোককে জঙ্গলের ভেতরে নিয়ে গিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে কেউ। আবার সেই ছবি চুপিসারে তুলতে আসে অন্য কেউ। ক্যামেরায় প্রমাণ হিসেবে ছবি তুলে রাখে! সব চেয়ে অবাক কাণ্ড হল, সেই ক্যামেরায় তোলা ছবির ডিভিডি করে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে! সেটাও একটা রহস্যময় পদ্ধতিতে! আরে! ওটা ...কী হচ্ছে... স্ক্রিনের ডান সাইড দিয়ে একটা হাত বেরিয়ে এল। হাতে ধরা পিস্তল। লোকটার দিকে তাক করে রাখা। ঝিঁঝির ডাক ভেদ করে একটা শিশের মত শব্দ হল। গাছে বাঁধা লোকটার বুক লাল ...মাথাটা ঝুলে পড়তে পড়তে হতভম্ব চোখে তাকিয়ে দেখল আকাশটাকে! তারপরে সব চুপ। স্ক্রিন কালো।

লোকটা মৃত্যুর জন্য ভয়ার্ত চোখে অপেক্ষা করছিল। লোকটাকে চিনতে পারছি না কেন! অথচ মনে হচ্ছে কোথায় দেখেছি। আমার এমন ভুলো মন ছিল না। কেনই বা সব গুলিয়ে যাচ্ছে! কেনই বা ধাঁধা লাগছে মনের চোখে? আজকের রাতটা আমাকে খানিকটা অস্থির করলেও পেড়ে ফেলতে পারবে না। আমাকে জানতে হবে এই ডিভিডি এখানে এল কেন? কেউ একজন এর পেছনে মাথা দিচ্ছে! তাকে খুঁজে এবারে বের করো সুভদ্র। শত্রুর শেষ রেখ না।

৩২

আমি নিশ্চুপ হয়ে অন্ধকার ঘরে বসে থাকি। কে? কারা? কাকে মরতে হল? কে মারল তাকে? আমার কাছে এই ডিভিডি পাঠানোর মানে কী? মেয়েটার সঙ্গে এই ডিভিডির সম্পর্ক কী? কোনও প্রশ্নের জবাব পাচ্ছি না! কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব মাথায় ঢুকেছে। এই জঙ্গল আমার চেনা। আর পিস্তল-ধরে রাখা হাতটাও খুব চেনা। হাতে একটা রোলেক্স ঘড়ি ছিল। অনেকদিন আগের একটা অপরাধের ছবি কেউ যত্ন করে তুলে রেখেছিল। সময় এসে গেছে তাকে বের করে দেওয়ার। প্রকাশ্যে আসার সময় হয়ে গেছে। তাই সে আসছে। আসছে যে, সেটাই জানান দিয়ে যাচ্ছে।

লোকটা মৃত্যুর জন্য ভয়ার্ত চোখে অপেক্ষা করছিল। লোকটাকে চিনতে পারছি না কেন! অথচ মনে হচ্ছে কোথায় দেখেছি। আমার এমন ভুলো মন ছিল না। কেনই বা সব গুলিয়ে যাচ্ছে! কেনই বা ধাঁধা লাগছে মনের চোখে?

আজকের রাতটা আমাকে খানিকটা অস্থির করলেও পেড়ে ফেলতে পারবে না। আমাকে জানতে হবে এই ডিভিডি এখানে এল কেন? কেউ একজন এর পেছনে মাথা দিচ্ছে! তাকে খুঁজে এবারে বের করো সুভদ্র। শত্রুর শেষ রেখ না। এক টুকরো সুতোই মৃত্যুবাণ হয়ে উঠতে জানে। এত অভিজ্ঞতার পরে এই ছোট কথাটা জানো না? সুতোটাকে টেনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করো। আগুনে ঝলসে দাও। মারো। মারো তাকে!

ঘরের বদ্ধ বাতাস কফিনের ভেতরে দেওয়া সুগন্ধী গা গুলিয়ে দেয় যেমন তেমন গুমোট আর ভয়াবহ ঠেকছে। একটু ঠান্ডা বাতাস চাই। ঘুম চাই স্নায়ু শক্ত রাখার জন্য। দুর্বলতা নয়।

কড়া কফি খেতে খেতে পুরো বিষয়টা নিয়ে ভাবি। এই ডিভিডিটা আরেকবার দেখতে হবে। ফের প্রজেক্টার চালু করে ছবি দেখতে বসে গেলাম। জঙ্গলটা আমাকে চিনতে হবে। জীবনের অনেক ছবি একটার সঙ্গে অন্যটা গুলিয়ে গেছে। জট ছাড়িয়ে নিয়ে এগোতে হবে। প্রত্যেককে ইনডিভিজুয়াল চিনে রাখতে হবে। জঙ্গলটা আমার চেনা ঠেকছিল কেন? অর্থাৎ আমি জঙ্গলটা চিনি। ব্রেনের কোন খোপে জঙ্গলের স্মৃতিটা আছে হে সুভদ্র। তুমি অতো বোকা নও। তাহলে। ক্যামেরা এগিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে লুকোন ঝোরা, মাঝে মাঝে চুপিসাড়ে পালিয়ে যাওয়া সাপ দেখলাম। এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে কোন মায়াময় গহীনে। ল্যাজটা সুরুত করে ঢুকে গেল! যাঃ! কত পাখি, কিন্তু খুব চঞ্চল হয়েছে ওরা। বসছে না কোথাও। অচেনা কেউ বা কারা এসেছে এখানে, ওদের আস্তানার কাছাকাছি। পছন্দ করছে না ওরা! কাউকে এই মুহূর্তে দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে পাখিদের হাবে ভাবে। ক্যামেরা এগিয়ে যাচ্ছে একটা গাড়ির খানিকটা দেখা যাচ্ছে। না, ওই গাড়ি আমার অচেনা। কিন্তু হাত বাঁধা লোকটাকে দেখাচ্ছে। জঙ্গলটাকে চিনেছি। আমি চিনেছি। চিনে গিয়েছি ওই জঙ্গলটা। ওটা চিলাপাতা ফরেস্ট। পিস্তল ধরা হাতটা চেনা খুব। ওটা আমারই হাত। কিন্তু কাকে মেরে দিলাম, তাকে তো চিনলাম না! লোকটা কে?

এই জঙ্গলেই আমি একবার মাত্র গিয়েছিলাম। পনের বছর আগের কথা। নাকি বিশ বছর? শ্যামল বলতে পারতো। নিখিল আরও ভাল বলতে পারতো। এখন কে বলতে পারবে, আর কে পারবে না —এসব ভেবে লাভ নেই। সব ভাবনার সমাধান নিজের হাতে।

আচ্ছা, নিখিলের কথায় মনে হল, আজ সকালে নিখিলের বাড়িতে যাব। অনেক কাজ প্লাস অভিনয়। ডিভিডি সাবধানে রেখে দিলাম।

মন থেকে রহস্যটা সরে যাচ্ছে না। একটা ভয়াবহ প্রমাণ নিয়ে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাকে ফাঁসিয়ে দিতে চেয়ে, সে কী চায়? টাকা? প্রচুর টাকা রয়েছে আমার। দিয়ে দেব যা চায়, যতটা চায়। সে কে জানার পরে টাকা নিয়ে সে কী করবে? সেগুলো ফের ফিরে আসবে আমারই কাছে। আর তাকে পাঠিয়ে দেব সেখানে, সেই চিলাপাতা ফরেস্টের সাফ করা একটুকরো জায়গায়। হাত পেছমোড়া করে রেখে পিস্তল তাক করে দাঁড়াব গিয়ে সামনে। এবারেও নিজ হাতে নিধনপর্ব চলবে লাশ ফেলে রাখব হাতির পায়ে চলা রাস্তার মাঝে! দুমড়ে মুচড়ে যাবে লাশ। কে যে কে, বুঝবে কার সাধ্যি! হা হা হা!

লাটাগুড়ি থেকে একটা ফোন এসেছিল। সামনেই

পুজোর মিটিং। লাটাগুড়িতে গাড়ি চালকদের একটিই সংগঠন আছে। চালসা, মালবাজার, মেটেলি, ওদলাবাড়ির মতো ছোট জায়গার গাড়ি চালকদের সংগঠন একাধিক। শ্যামলের নাম আছে লাটাগুড়ির সংগঠনে। তো ওরা পুজোর সময় গাড়ির ভাড়া বাড়াচ্ছে। এ নিয়ে পর্যটকেরা ক্ষুব্দ। লাটাগুড়ি থেকে মাল জংশন ছিল সাতশো থেকে আটশো টাকা। পুজোর মুখে কেন হাজার-বারোশো হবে? এটা চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

আমার বিরক্ত ঠেকছিল। আছি এক অন্য ধারার মধ্যে, বেফালতু ঝামেলা কেন নেব মাথায়। বলে দিলাম, শ্যামলকে বলে দেব। ও অনেক আগে সংগঠনে ছিল। এখন তো নেই। কাজেই ওর নামটা নাই বা রাখলেন! ফোনের সুইচ অফ করে বসে রইলাম।

রাতটা পার করে চলে গেলাম নিখিলের বাড়িতে। আজ ভারি বৃষ্টি হতে পারে। একটা ঘন মেঘের ছায়া চারপাশে নেমে আসছে। গ্রামের দিকে বৃষ্টি হলে জল কাদায় মাখামাখি হতে হয়। রাস্তার মাঝে মাঝে জল জমে আছে। ডিভিডিতে যে জঙ্গলটা দেখেছি, সেখানে এক জায়গায় জল জমে ছিল। প্রথমেই চিনে নেওয়া উচিত ছিল। আমি চিনতে পারিনি! কেন যে চিনতে পারলাম না!

গাড়ি ডানদিকে নেমে যাচ্ছে। এবারে রাস্তা ক্রমে সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। এই রাস্তাটা ফের বাঁ দিকে ঘুরে গেলে নিখিলদের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে যাব। গাড়ি আর যাবে না। গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে যেতে হবে।

গাড়ি থেকে নামলাম। বেড়ার বাড়ি। মাটির মেঝে। বেড়ার গায়ে ভেজা শাড়ি গুঁজে মেলে রেখেছে। এদিক ওদিক তাকালাম। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কী করবো ভাবছি, সেই সময় এক বৃদ্ধা রাজবংশী বেরিয়ে এল। ঘাড় কুঁজো করে তাকাল। চোখ কুঁচকে এগিয়ে এল —কে? কারে খুঁজেন নাকি?

—নিখিলের মা এখানে থাকে!

—ও হ রে! নিখুলার মা রে ডাক। বাবুনোক আইচ্ছে।

ছায়া ছায়া ঘরের ভেতর থেকে ছোটখাটো একটি মানুষ বেরিয়ে এল। যেন প্রাণহীন। আমি চিনতে পারলাম। নিখিলের মা।

আমাকে দেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল নিখিলের মা। গায়ে একটা কাপড় জড়িয়ে রেখেছে। কষ্ট করে তাকাল —নিখিলের বাপ বাসায় ফেরে নাই। কোথায় গেছে, আমি জানি না। নিখিল আসে না। মায়া আসে না।

আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করলাম —আরে শুনুন। আমার সঙ্গে নিখিলের কথা হয়েছে। ওর সঙ্গে কথা বলিয়ে দেব। মায়ার সঙ্গেও। চলুন, ঘরের ভেতরে বসি।

বাড়িটা ভীষণ নির্জন। ছমছম করছিল। আধো অন্ধকার ঘরে গিয়ে বসলাম। মোবাইল ফোন বের করে রেকর্ড করা ছেলে-মেয়ের কথা শুনিয়ে দিলাম। ছেলের গলা শুনে মায়ের চোখের জল বাঁধ মানে না। মায়ার সুখের কথায় মা উজ্জ্বল মুখে কাঁদে। আমি হাঁপ ছাড়ি। লাকিলি বাড়ি ফাঁকা। প্রশ্ন করার কেউ নেই। নিখিলের মাকে যা বোঝাবো, সেটাই বুঝবে। বাইরের জগত সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ এই মহিলা।

—এই বাসাবাড়িতে একা থাকবেন কেন? আমার বাড়িতে চলুন। দুটো রান্না করে দেবেন আমাকে। হোটেলের রান্না খেয়ে পেট ভাল যাচ্ছে না। ওখানে থাকবেন। যাবেন? তো চলুন আজ।

মাথা নাড়ে নিখিলের মা —না। নিখিলের বাপ এসে আমাকে দেখতে না পেয়ে চলে যাবে ফের। আমি এখানেই থাকব।

ধুস! অ্যাবসার্ড! থাক পড়ে এখানে! হাতে কিছু টাকা দিয়ে এলাম। নিখিল পাঠিয়েছে আমাকে ওর মাকে দেওয়ার জন্য। টাকা অনেক কষ্ট মুছে দেয়। মলম হয়ে আসে জীবনের ক্ষতে। ফিরে এলাম গাড়ির কাছে। একবার তাকিয়ে দেখে নিলাম। বাই নিখিল, বাই নিখিলের বাপ। আর দেখা হবে না! এদিকে আর পা দিচ্ছি না।

৩৩

কিছু বই এসেছে। অনলাইনে অর্ডার করেছিলাম। সেগুলো লিস্ট অনুযায়ী মিলিয়ে দেখছি। আজ একজন আয়া রেখেছি সেন্টার থেকে। রান্না ছাড়াও ঘরবাড়ি সাফ সুতরো করা, দেখেশুনে রাখা ইত্যাদি করবে।

“যখন মধু ব্যানার্জির হাত থেকে গন্ডারের শিঙের ব্যাগটা খাদে ফেলে দিয়েছিলাম, আর মধু ব্যানার্জি পুলিশের ভয় দেখিয়েছিল আমাকে পোচার বলে ধরিয়ে দেবে, তখন এক সেকেন্ড লেগেছিল লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে দিতে। সেই ঘটনার পরে অনেকদিন ওই এলাকাতে যাইনি। মধু ব্যানার্জির ছেলে স্বরূপ ব্যানার্জি এসেছিল পাহাড়ে খোঁজ করতে। শুনেছি, সে নাকি পুলিশকে বলেছে কেউ একজন গন্ডারের শিং বিক্রি করতে চেয়েছিল ওর বাবা মধু ব্যানার্জির কাছে। মধু ব্যানার্জি লোকটাকে ধরিয়ে দিতে, চিনে নিতে দেখা করতে রাজি হয়েছিল।”

মাঝবয়সী মহিলা। শ্যামলের ঘরে ওর থাকার ব্যবস্থা করেছি। সিকিউরিটি গার্ড আছে। অসুবিধে নেই। রাতে মাঝে মাঝে ডিভিডিটা দেখি। ক্যামেরা কার হাতে, সেটা বোঝার চেষ্টা চলছেই আমার। কে ছিল সেদিন? কার হাতে ছিল ক্যামেরাটা? এত বড় একটা ঘটনা ঘটে চলেছিল, আমি বুঝতে পারিনি! ইডিয়ট একটা। কতটা প্ল্যানমাফিক কাজ হয়েছে আমার পেছনে, আমি বুঝতে পারিনি। এখনও হয়ে চলেছে! কে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে আমি জানি না? সত্যম নেই। শ্যামল বেঁচে থাকলেও ও আমাকে ভয় দেখাবে এমন কোনও কারণ নেই! তাহলে কে? কে আমার শান্তির জীবনে ঝড় আনতে চেয়েছে? সে কী চায়? আর আশ্চর্য ঘটনা হল সেই মেয়েটাকে খুঁজেই পাওয়া গেল না! আমার মন বলছে সে আছে আমার আশপাশেই। খুব সাবধানে, নিঃশব্দে অনুসরণ করে চলেছে আমাকে! আড়াল থেকে নজর রেখেছে সে!

এখন কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না। রুক্মিণী আসেনি। ফোন করেনি। ও টাকা পয়সার সাম্রাজ্য নিয়ে ভাল আছে। রাঘবও যোগাযোগ করেনি। এমনটাই নিয়ম সুপাড়ি কিলারদের। যখন মধু ব্যানার্জির হাত থেকে গন্ডারের শিঙের ব্যাগটা খাদে ফেলে দিয়েছিলাম, আর মধু ব্যানার্জি পুলিশের ভয় দেখিয়েছিল আমাকে পোচার বলে ধরিয়ে দেবে, তখন এক সেকেন্ড লেগেছিল লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে দিতে। সেই ঘটনার পরে অনেকদিন ওই এলাকাতে যাইনি। মধু ব্যানার্জির ছেলে স্বরূপ ব্যানার্জি এসেছিল পাহাড়ে খোঁজ করতে। শুনেছি, সে নাকি পুলিশকে বলেছে কেউ একজন গন্ডারের শিং বিক্রি করতে চেয়েছিল ওর বাবা মধু ব্যানার্জির কাছে। মধু ব্যানার্জি লোকটাকে ধরিয়ে দিতে, চিনে নিতে দেখা করতে রাজি হয়েছিল। পাহাড়ে ছুটি কাটাতে এসে একটা লোকের সঙ্গে দেখা হয় ওঁর। সে নাকি গন্ডারের শিং বিক্রি করতে চেয়েছিল। ছেলেকে ফোনে সে কথা জানিয়েছিলেন মধু। পোচারের নাম দেবু তামাং।

এই পর্যন্ত শুনে হাঁপ ছেড়েছি। মনে করে এই নামটা বলেছিলাম মধু ব্যানার্জিকে। তারপরেই মধুর খাদ-প্রাপ্তিতে আমার কিছু যায় আসে না। যাও মধু, খাদের গহীনে পরম শান্তিতে থাকো। আচ্ছা, এতদিনে কি কঙ্কালটাও অক্ষত আছে? না মনে হয়! তাছাড়া ওই খাদে কেউ কখনই নামবে না। কঙ্কাল চোখে পড়ার কারণও নেই! এতদিনে কঙ্কালটা কি অক্ষত আছে? দেখতে যাব না। নিজেকে নিজে খোঁড়ার দরকারও বা কী? মধু বাড়াবাড়ি করেছিল। গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়েছিলে মধু? অথচ গন্ডারের শিঙের সম্পর্কে ভুল, মিথ্যে তথ্যগুলো শুনে কী আশায় চোখ চকচক করে উঠেছিল? রাতের সহচরী পাওয়া যাবে কিনা জানতে রুম বয়কে ধরেছিলে না? জানি জানি মধু! কত মধু জমিয়ে রেখেছ হৃদয়ে, জানি। বুঝতে পেরেছিলাম। তখনই গন্ডারের শিঙের প্রসঙ্গ এল। আর তোমার মধ্যে লুকিয়ে থাকা গোয়ান্দা জেগে উঠল। জেগেছিল, ভাল কথা। এখন ঘুমিয়ে থাক। বেশিক্ষণ জেগে থাকলে চোখ কট কট করবে। শরীর ঝুলে যাবে। তার চেয়ে এটাই ভাল হল না? শরীরের ছটফটানি নেই বলে সব শান্ত।

তো সুপাড়ি কিলারদের থেকে শিখেছি একটা কেস সলভ করার পর সেদিকে আর পা না দিতে। আমার দরকারই বা কী ?

বইগুলো গুছিয়ে রাখলাম। রাস্কিন বন্ডের বই এনেছি। কিছু হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টের ওপর বই এনেছি। আসলে বিভিন্ন স্বাদের বই পড়া আমার নেশা। এক ঘণ্টার ফ্লাইট ট্যুরেও বই থাকে আমার সঙ্গে। ক'টাদিন বই পড়ে, ভাল মুভি দেখে কাটাতে চাই। কিন্তু হয়েই ওঠে না। আজ সব ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে কাটাই রাতটা। একটা বই নিয়ে বিছানায় চলে যাই। বাঃ! ফাইন।

বেডসাইড ল্যাম্পটা জ্বেলে দিয়ে বই নিয়ে শুয়ে পড়লাম। এখন বৃষ্টি নেই। কাল রোদ উঠবে। নিজে বাজারে যাব। বড় বড় ডিম ভরা বাটা আনতে হবে। আর কুচো চিংড়ি। লাউ ঘন্ট। এই মহিলা রাঁধে ভাল।

বই পড়তে পড়তে তন্দ্রা আসছে। হাত থেকে বই পড়ে গেল মেঝেতে। চমকে জেগে উঠে বইটা মেঝে থেকে তুলছি, কার পায়ের আওয়াজ পেলাম। এত রাতে কে এসেছে আমার বাড়িতে? কেনই বা এসেছে? নিঃশ্বাস বন্ধ করে কান পেতে রয়েছি। হ্যাঁ, ঠিক শুনেছি আমি। আমার কাঠের বাড়ির লম্বা সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাচ্ছি। কেউ যেন খুব সাবধানে উঠে আসছে। পা টিপে

টিপে! সেই মেয়েটা নয় তো? সে চুপি চুপি উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে! কেন আমাকে এভাবে ফলো করে? চট করে বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। আমার সোনাটা বালিশের পাশে রেখেছি এই একটু আগেই। ওটা সঙ্গে না থাকলে ভরসা পাই না।

ব্যালকনিতে যাচ্ছে পায়ের শব্দ... সেন্টার টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা খেল। একটা ক্যাচ শব্দ... এখন পায়ের শব্দটা নেই। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখছে সে চারপাশ। এবারে আসছে খুব সাবধানে আমার ঘরের দিকে। লম্বা বারান্দায় পা টিপে হাঁটার শব্দ পাচ্ছি। যে এসেছে সে কোথায় যাচ্ছে? পিস্তল নিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে আছি। মনে হচ্ছে আচমকা আক্রমণ করতে এসেছে! একজনের পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ ...নেমে যাচ্ছে কি? চলে যাচ্ছে? কেন এসেছিল? কী দেখতে এসেছিল? বের হবো? দরজার ছিটকিনিতে হাত দিয়েই থেমে গেলাম। বারান্দার শেষ প্রান্ত থেকে পায়ের আওয়াজটা স্পষ্ট হচ্ছে। মানে আমার বেডরুমের দিকে আসছে। কাঠের পুরনো বাড়ি বলে আস্তে হাঁটলেও শব্দ ওঠে হালকা হয়েও। তাহলে এদিকে কেউ আছে! যে আছে, সে বাড়িটা ঘুরে দেখছে! অথচ সিঁড়িতে শব্দ হল! সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল কে? না, নামেনি তো! পায়ের আওয়াজ উঠে আসছে! একাধিক লোক এসেছে এই বাড়িতে! আমার সিকিউরিটি গার্ড আমাকে একটা ইশারা দেবে তো! কী করছে লোকটা? লোকটাকে মেরে দিল নাকি? আমি লোডেড পিস্তলটা নিয়ে অপেক্ষা করে আছি। আমার দরজা লাথি মেরে ভেঙে ফেলতে পারবে না একা কেউ। কিন্তু যদি একাধিক মানুষ সে চেষ্টা করে, তবে কী হবে বলতে পারছি না। এত বড় বাড়িকে পুরো সিকিউরিটি দিয়ে রেখেছি বলা ঠিক না। তাহলেও যে কেউ আমার বেডরুমের সামনে উঠে আসবে? না, আমি ফোন করে দেখি গার্ডকে। মোবাইল বের করে কল করি। সুইচড অফ! আশ্চর্য! হচ্ছেটা কী? এখন কি থানায় ফোন করব?

থানায় ফোন করাই যায়, কিন্তু যে বা যারা এসেছে, তারা কে বা কারা আমি জানি না। বাই চান্স এরা আমার সম্পর্কে এমন কিছু জেনে এসেছে যা বাইরে প্রকাশ না পাওয়াই ভাল! আই হোলে চোখ রেখে কিচ্ছু দেখতে পারছি না! বাইরেটা অন্ধকার হয়ে আছে! কিন্তু আমার বাড়িতে আলো জ্বলে সারা রাত! আলো নেভালো কে? যারা এসেছে, তারাই আলো নিভিয়েছে। অন্ধকারে ঘোরাফেরা করে যাচ্ছে।

ওরা কি এখনও আছে বাইরে? কী করছে লোকগুলো? মেয়েটাও কি ওদের সঙ্গেই আছে? কাদের নিয়ে এল মেয়েটা সঙ্গে করে? একটা গ্রুপ আমার পেছনে পরে আছে আদা জল খেয়ে! একবার বেরিয়ে গিয়ে গুলিতে শেষ করে দেব? রাগ গনগন করছে মাথায়! এভাবে চোরের মতো দাঁড়িয়ে থাকব আমি?

পরক্ষণেই মাথা ঠান্ডা করি। আমাকে শান্ত থাকতে হবে। রাতটুকু পার করে যা করার করতে হবে। কিন্তু কারা এসেছিল, এটা জানা জরুরি। জানব কী করে?

৩৪

সারাটা রাত দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিলাম। এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজলাম না। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত আচমকা আক্রমণ হয়ে থাকে। রাত যুবতী হলে খেলা জমে ওঠে। রক্তের খেলা! সে ভারি মজার। যেমন সেদিন সত্যমের ক্ষেত্রে হল। রুক্মিণী সত্যমকে কনিয়াক খেতে দেখেছিল। কনিয়াক খেতে খেতে সত্যম নাচে গানে মত্ত ছিল। আমি খেয়াল রাখছিলাম সত্যমের দিকে। সত্যম যখন ছোট স্কার্ট পরা তরুণীর কোমর ধরে নাচার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, আমার বুদ বুদ করে হাসি উঠছিল পেট থেকে। ভাবছিলাম, এখন আমিই হলাম সত্যমের ভাগ্য নিয়ন্তা। আমি যা বলবো, তাই হবে। আমার ইচ্ছেয় সত্যম বাঁচবে। আমার ইচ্ছেয় মরবে। হলও তাই। মধ্য রাত পেরিয়ে যাচ্ছে, সত্যম নেশায় জমে পাথর, তখন খেলা শুরু করে দিয়েছিলাম। এস সত্যম, চল, এবারে বাই বল, বাই বল! বলতে বলতে গাড়িতে উঠে যাও। স্টিয়ারিং ঘোরাও। যাও, রওনা হয়ে যাও।

হয়ে গেল রওনা। সত্যম হয়ত মৃত্যুর আগের মুহূর্তে আমার চালাকি ধরে ফেলেছিল। অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করেছিল। পারল না।

একটু ঝিমুনি এসেছিল। ঝট করেই সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। কে জানে হয়ত মৃত্যু দরজার বাইরে অপেক্ষমাণ, আর আমি ঘুমিয়ে পড়ছি! পিস্তল হাতে

“একটু ঝিমুনি এসেছিল। ঝট করেই সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। কে জানে হয়ত মৃত্যু দরজার বাইরে অপেক্ষমাণ, আর আমি ঘুমিয়ে পড়ছি! পিস্তল হাতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যে কতখানি ধৈর্যের, সেটা আজ না হলে কখনই বুঝতে পারতাম না। একটা একটা করে মুহূর্ত পার করছি, আর সতর্ক রয়েছি আরেকবার পায়ের আওয়াজ শোনার জন্য। এখন শ্মশানের নিস্তব্ধতা আমার বাড়ির চারপাশে। কান পাতি দরজার গায়ে। কেউ কি এল? পা ঘষে ঘষে চলে যাচ্ছে যেন! একটা শব্দ হচ্ছে টিপ টিপ!”

ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যে কতখানি ধৈর্যের, সেটা আজ না হলে কখনই বুঝতে পারতাম না। একটা একটা করে মুহূর্ত পার করছি, আর সতর্ক রয়েছি আরেকবার পায়ের আওয়াজ শোনার জন্য। এখন শ্মশানের নিস্তব্ধতা আমার বাড়ির চারপাশে। কান পাতি দরজার গায়ে। কেউ কি এল? পা ঘষে ঘষে চলে যাচ্ছে যেন! একটা শব্দ হচ্ছে টিপ টিপ! দরজা ছেড়ে বেডসাইড জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখানে পুকুর তৈরি করেছিল আমার দাদু। মাছ পোষার শখ হয়েছিল। পর্দা সরিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে কিছু দেখা যায় কিনা দেখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। নাক ঠেকে যাচ্ছে কাচের পাল্লায়। এদিকটা অন্ধকার। বাগান, পুকুর!

রাতটা কাটল কীভাবে কে জানে! জানালার ঘষা কাচের গা ঘেঁষে লেপটে আলো এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। ফের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। কোথাও শব্দ নেই। সিকিউরিটি গার্ডকে ফোন করলাম ফের। এবারেও সুইচড অফ।

কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে! সে কি! আমার বাড়ি কি পুরোপুরি দখল হয়ে গেল? পিস্তল তাগ করে এক ঝটকায় দরজার একটা পার্ট খুলে নিজেকে অন্য পার্টের আড়ালে রাখলাম। পিস্তলের নল ঢুকিয়ে দেব আজ পেটে।

চুপি চুপি কেউ উঁকি দিল ঘরের ভেতরে। আমাকে বিছানায় দেখতে না পেয়ে আরেকটু এগিয়ে এল। শাড়ির খানিকটা দেখতে পাচ্ছি। ওখানেই, দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে রইল। আমি দরজার পাল্লা টেনে খুলে দিতেই সামনে পড়ে গেল সদ্য বহাল হওয়া কাজের মাসি।

—তুমি? এখানে? কেন? সন্দেহে যুগপৎ অবাক প্রায়।

—আপনি উঠতেছেন না! ভাবছি শরীল খারাপ নাকি!

—বেশি ভাববে না। চা করতে জানো?

—জানি।

—তো, দাঁড়িয়ে আছ কেন? কড়া চা কর। লিকার। চিনি দেবে না।

বউটা যেতে যেতে ফিরে তাকাল। ওর চোখে কি ভয় ছিল? নাকি কৌতুক? এই বউটা আমার কাছে এসে কাজ চেয়েছিল। কেন আমারই কাছে?

—কাল চোর এসেছিল। টের পেয়েছিলে? নাকি নাক ডেকে ঘুমিয়েছ? আমার গলায় রাগ ছিল। বউটা দাঁড়িয়ে পড়ে ভয়চকিত চোখে চারপাশে তাকাল। যেন চোর ওকে দেখা দেওয়ার জন্য এখনও দাঁড়িয়ে আছে!

ইশারায় চলে যেতে বললাম। কিন্তু মন বলছে এই বউটিকে নজরে রাখ সুভদ্র। এমন হতে পারে বউটি সত্যি ‘কাজ’ জানে। এমন হতে পারে এই বউটি সেই মেয়েকে দেখেছে! আচ্ছা! আসুক চা নিয়ে।

বউটির হাতে চায়ের কাপ। ছোট ট্রের ওপর চায়ের কাপ। পাশে কাচের গেলাসে জল। অনেকে চা খাওয়ার আগে জল খান। আমি খাই না। বউটি আমার অভ্যেস জানে না। অন্যের অভ্যেস জানে। অথচ ও বলেছে আগে কোথাও কাজ করেনি! তাহলে এই অভ্যেস কার ছিল? গ্রামের লোকের কি এই অভ্যেস আছে?

কথা বাড়ালাম না। বউটি চলে গেল। আজ ব্রেকফাস্ট করে বের হব। কিছু কাজ আছে। ইন্দ্রকুমার একটা ঝামেলায় ফেঁসেছে। ওর নার্সিং হোম থেকে শিশু চুরির অভিযোগ উঠেছে। এখন গোপন আড্ডায় সে সবের মোকাবিলার রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে। ঝামেলা আছে অনেক। নানা দিকে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। গাড়ি ড্রাইভ করছি। একটু আনমনা ছিলাম। ডিভিডির ছবিগুলো চোখের সামনে ভাসছিল। একটা গহীন জঙ্গল। ঝিমঝিমে নিশ্চুপ শাল গাছ। একটা লোক ভয়ার্ত চোখে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কে লোকটা! খুব চেনা যেন! কোথায় দেখেছি ওকে? যখন থেকে দেখেছি, তখন থেকে লোকটার ভয়ার্ত চোখ দুটো আমাকে অনুসরণ করে চলেছে। রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে একটি চায়ের দোকান আছে। কয়েকটা লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমার গাড়ি কাছাকাছি হতেই ওই লোকগুলোর মধ্য থেকে একজন রাস্তা পার হয়ে গেল। চমকে উঠলাম। লোকটা নিখিল না? আচমকা ব্রেক কষতেই ঝাঁকুনি খেলাম। এই রাস্তায় ট্র্যাফিক জ্যাম বলতে কিছু নেই। নাহলে সেবারের মতো র‍্যাশ ড্রাইভ করতে গিয়ে স্পাইন ভেঙে ফেলতাম। কিন্তু লোকটা গেল কোথায়? সে যে-ই হোক, নিখিল হতে পারে না। আসলে নিখিলের প্রতি আমার মনে হয়ত খানিক জায়গা আছে। ছেলেটা ভাল মানুষ ছিল। হয়ত অবচেতনে ও আছে। গতরাতের অদ্ভুত ঘটনা, ডিভিডির

ছবি আমাকে একটা ঘোরের মধ্যে ফেলে রেখেছে হয়ত। নিজেকে এসব থেকে সরাতে হবে। নিখিলের ইহজগতে বসবাসের জায়গা নেই। ও কী করে নিখিল হবে? মাথা থেকে ভাবনা ঝেড়ে ফেলে গাড়ি স্টার্ট করেছি। ঝট করে মনে হল, লোকটা নিখিল নয়, কিন্তু লোকটা তো ছিলই। সে রাস্তা পার হচ্ছিল। গেল কোথায়?

মন থেকে ভাবনা সরাতে পারছি না। ইন্দ্রর নার্সিং হোমে গোপন মিটিং রুমে ঢুকে দেখি পরিচিত মুখ রয়েছে। এনজিও করে দীপন ঘোষ, সে বসে আছে। সে ইন্দ্রর ডান হাত। শিশুপাচারে তার হাত যথেষ্ট পাকা হাত। পুরনো আয়াদের পালটে ফেলা হয়েছে। তারা কোথায়, কেউ জানে না ইন্দ্র ছাড়া। এটা ভাল কাজ করেছে ইন্দ্র। এখন দীপন ঘোষ কী করে সব সামলাবে, সেটাই হল কথা। ইন্দ্র ভয় পেয়েছে। একটু যেন নার্ভাস লাগল ওকে। আমার ভয় নেই। ঘটনাটা আমি জানি। কিন্তু জেনেও ওদের ঘাটাইনি বলে ওরা আমাকে বিশ্বাস করে। আমি যথেষ্ট সুযোগ পাই এখানে। যেমন রুক্মিণীকে দু' দুবার সাফ সুতরো করে দিয়েছে। অথচ কিছুই জানতে চায়নি। ওখানে থেকে দু'-চারটে পরামর্শ দিয়ে চলে এলাম। ভাল লাগছিল না মনটা। অস্থির ভাব খেলা করে বেড়াচ্ছে। আসার সময় কাকে দেখলাম? নিখিল নয়? তাইতো! নিখিল হবে কী করে! গাড়িতে উঠছি, এক গাড়ি পুলিশ ঢুকছে ইন্দ্রর নার্সিং হোমে। দ্রুত ফোন বের করে ইন্দ্রকে ধরলাম। পুলিশ এসেছে। দীপনকে নার্সিং হোমের পেছনের আবর্জনা ফেলার জায়গা দিয়ে বের করে দাও। তোমার সঙ্গে দীপনকে দেখা ঠিক হবে না। দীপনকে পুলিশ সন্দেহ করে। দরকারে হাতে নাও ব্যাপারটা। লোভীকে খোঁজ। তাকে দিয়ে কাজ হবে। দুষ্ট ক্ষতকে কেটে ফেলে দাও। দীপনকে পুলিশ আরেস্ট করুক। দীপনের মুখ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা কর। তুমি তোমার নার্সিং হোম বাঁচাও।

ফোন পকেটে পুরে গাড়ি স্টার্ট করলাম। স্যরি দীপন!

৩৫

ঘর অন্ধকার করে প্রজেক্টর চালু করে বসেছি। ছবি আসছে। এই জায়গাটা দেখলেই একটা মত্ততা আসছে। উত্তেজনায় হাত শিরশির করে ওঠে। সেই ঘন জঙ্গলে ভরা ফরেস্ট। একটা সময় এই ফরেস্টই ছিল আমার গোপন মিটিঙের জায়গা। ঘুরঘুরে দুপুরেও মিটিং করেছি। তখন অসমের কিছু পোচার ছিল। একটা সময় চোরাচালান এতটাই বেড়ে গেল, আমি আস্তে আস্তে নানা অজুহাতে সরে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপরে আর চিলাপাতায় মিটিং হয়নি মানে আমি করিনি। খোলাখুলি, নিজেকে সম্পূর্ণ অনাবৃত করে অন্যের কাছে হালহদিশ সব বাতলে ফেলা বন্ধ করে দিয়েছি তারপর থেকেই। কথায় বলে, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। আমি সেটাই অনুভব করেছি। আর তাই যা করি, নিজের বুদ্ধি আপ্লাই করে করি। দরকারে টাকা ছড়িয়ে ভাড়াটে জোগাড় করি। খুনিয়ায় একবার কিছু মালকড়ির ভাগ বাটোয়ারা হয়েছিল। চাপড়ামারি হয়ে ধূপঝোরায় যেতাম। মূর্তি নদী বড় প্রিয় ছিল। মনে মনে কতবার মূর্তিতে স্নান করেছি! ক্যামেরাম্যান বাঁয়ে দাঁড়ানো। আচ্ছা! ক্যামেরাম্যান যদি বাঁ দিকে থাকে, আমি ডাইনে। আমার হাতটা দেখা যাচ্ছে। কে সেই ক্রুশিয়াল টাইমে আমারই বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে আমার খুন করা দেখে যাচ্ছে, ক্যামেরায় ফটাফট ছবি তুলে যাচ্ছে? আমি নিশ্চয় তাকে চিনি। হয়তো সে আমারই পাশে বসে সেখানে গিয়েছিল একটা অপারেশন-এর ভিডিও করতে! তার উদ্দেশ্য কী ছিল? আমার বিরুদ্ধে একটা মোক্ষম প্রমাণ জোগাড় করে রাখা! এখানে হয়তো আমাকে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না। কে জানে আমার পেছনে যে বা যারা লেগে আছে, তাদের কাছে আরেকটা ডিভিডি নেই? সেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আমার কর্মকাণ্ড! আশ্চর্যের বিষয় হল এভাবে আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চায় কিনা বুঝতে পারছি না। ব্ল্যাকমেইল করলে বলুক কী চায়! টাকাই চাইবে অবভিয়াসলি। টাকা ছাড়া আর কী আছে! সে বিষয়ে কোনও অপশন নেই। তো সেটা নিয়ে আমাকে সব প্রমাণ ফিরিয়ে দিক। টাকা নেবে। কিন্তু সব প্রমাণ ফিরিয়ে দেবে? আমি হলে দিতাম কি? হোল লাইফ এমন সোনার ডিম পাড়া হাঁসের সঙ্গে কে থাকতে চাইবে না? কে করছে এগুলো? যে করছে, সে চিলাপাতায় সেদিন কী হয়েছিল জানে! জায়গাটা জানে! এখন প্রশ্ন যেটা আমাকে চিবিয়ে খাচ্ছে, সেটা হল,

আজ হঠাৎ করে গদাধর বস্তির নাগরু রাভার ফোন এসেছিল। একটা মালের অর্ডার আছে। এই মুহূর্তে আমি কাজ করতে চাচ্ছি না। কয়েকটা দিন দূরে থাকতে হবে। কিছুটা গা ঢাকে দিয়ে থাকারই মতো। নাগরু কি জাতীয় মাল চায়, স্পষ্ট করে বলেনি। ওরা নাকি গতমাসে বাড়িতে হরিণ মেরে ভোজের ব্যবস্থা করেছিল নাগরু। বনকর্মীরা খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে দু'জনকে ধরেছে। নাগরুকে ধরা সহজ না। ও দীর্ঘদিন ধরে চোরাশিকার করে আসছে। বনকর্মীরা কি সেটা জানে না? বুঝি ভাই কিছু কিছু বুঝি।

এতদিন কেন সে চুপ করে ছিল? এতদিন ধরে কিসের জন্য অপেক্ষা করছিল আমাকে ব্ল্যাকমেইল করার। হয় ডিভিডিটা সদ্য সদ্য তার হাতে এসেছে। নয়তো সে একটা বড়সড় মাল কামানোর জন্যই অপেক্ষা করে যাচ্ছিল। এই ক্যামেরাম্যানকে আমার চাই! যে কোনও মূল্যে চাই সুভদ্র! যে কোনও মূল্যে! কিন্তু কোনও সূত্র পাচ্ছি না তাকে চিনে নেওয়ার!

আজ হঠাৎ করে গদাধর বস্তির নাগরু রাভার ফোন এসেছিল। একটা মালের অর্ডার আছে। এই মুহূর্তে আমি কাজ করতে চাচ্ছি না। কয়েকটা দিন দূরে থাকতে হবে। কিছুটা গা ঢাকে দিয়ে থাকারই মতো। নাগরু কি জাতীয় মাল চায়, স্পষ্ট করে বলেনি। ওরা নাকি গতমাসে বাড়িতে হরিণ মেরে ভোজের ব্যবস্থা করেছিল নাগরু। বনকর্মীরা খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে দু'জনকে ধরেছে। নাগরুকে ধরা সহজ না। ও দীর্ঘদিন ধরে চোরাশিকার করে আসছে। বনকর্মীরা কি সেটা জানে না? বুঝি ভাই কিছু কিছু বুঝি। কখন যে প্রজেক্টর অযথা সাদা পর্দা দেখিয়ে যাচ্ছে, খেয়ালই করিনি।

উঠতে গিয়ে মনে হল একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে। গুনগুন করছি —রাত বাকিইইই, কাজ বাকিইইই...! প্রজেক্টর রুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম। এদিকটা বাড়ির পেছন দিক। একটা সরু প্যাসেজ জিলিপির প্যাঁচের মতো ঘুরপাক খেয়ে একটা ছোট সিঁড়ির কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেখানে সামনেই ওয়াল। ওপাশ থেকে দেখলে দেওয়াল জোড়া ফলে ফুলে শোভিত বাগান মনে হবে। তারপরে মনে হবে এটা আসলে দেওয়াল-ছবি। ওয়াল পিকচার। বিশেষভাবে এই ওয়ালে স্লাইডিং ব্যবস্থা করা আছে। জায়গামতো চাপ দিলে ওয়াল সরে যাবে একমানুষ সমান।

বেরিয়ে এসে ফের ওয়ালকে ওয়ালের জায়গায় রেখে দিলাম। এবারে আমার বাইরে বেরিয়ে কাজের মাসির ঘরে উঁকি দেওয়ার কথা। বউটাকে সন্দেহ করার মতো কিছু পাইনি। আবার পাইনি বলাও যেন ভুল। কুছ তো হ্যায় বলেই মনে বুড়বুড়ি কাটছে মন-মাছটা। মাঝে মাঝে ঘাই মেরে উঠছে —ও যেদিন এল, সেদিনই রাতের অতিথিরা এসেছিল। অথচ ও কিছু টের পায়নি? না-ই পেতে পারে। তবু ওকে সন্দেহ থেকে মুক্ত রাখতে পারছি না। আজ নিঃশব্দে ফলো করে দেখব মহিলা কী করছে এই রাতে।

ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে। হ্যারিকেন জ্বালিয়েছে? লালচে আলো একটু আভা বাইরে লুকিয়ে উঁকি দিয়েছে কেউ আসছে কিনা দেখতে! দরজার মুখে দাঁড়ানো বোকামি। পেছন থেকে যে কেউ এসে পিঠে ঠান্ডা নল চেপে ধরতে পারে। সামনে থেকে দরজা খুলেই আমার মুখোমুখি হয়ে যাবে যে কেউ। আড়ালে যাই। বড্ড কাদা এখানে। পা চেপে চেপে হাঁটতে হচ্ছে। জানালা খোলা থাকা উচিত নয়। না, জানালাটা বন্ধ। ঘর কোনও শব্দ নেই। ঘুমিয়ে পড়েছে কি? তাহলে আলো কেন? আস্তে আস্তে কান চেপে ধরলাম জানালায়। না, কোনওই শব্দ নেই। তাড়াতাড়ি ঘুমোয় না বলেছিল। আজ কেন ঘুমিয়ে পড়েছে? নিঃশ্বাসের শব্দ নেই! ঘুমের শব্দ থাকে। ঘর কথা বলে। এখানে সব কেমন নিশ্চুপ! মর্গ।

যা অস্বাভাবিক, সেটাই আমার বুদ্ধির দরজায় আঘাত করে বরাবর। মহিলাটি ঘরে নেই। তাহলে কোথায় যেতে পারে এই রাতে? আমি অপেক্ষা করে থাকব।

অন্ধকার ক্রমে বেড়ে উঠছে। ঘরের ভেতরে উঁকি দিলাম। আলো যে টুকু আসছে, সেই রাস্তাটুকু দিয়ে ঘরের যতটা দেখা যায়, দেখে নিলাম। ঘরে কেউ নেই। পেছন দিকে চলে গেলাম। কেউ আসছে... কেউ আসছে...! পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি।

গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে কেউ আসছে। দ্রুত এসে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

কি আশ্চর্য! এই মহিলা আমার কাছে থেকে স্পাইং করছে? কে এসেছিল গতরাতে। এই মহিলা জানে? ও সব জানে। ওকে কেউ বা কারা আমার গতিবিধি জানতে পাঠিয়েছে! আমার বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল কারা, সেটাও সম্ভব হয়েছে এই মহিলার জন্য। আমি বাড়িতে সিকিউরিটি রেখেছি। সেখানেও এই দু' নম্বরি রয়ে গেছে। এই জন্যই সত্যম আর শ্যামল অস্ত্রগুলো পুকুরে ডুবিয়ে রাখার সময়-সুযোগ পেয়েছে। তখন এই মহিলা এই বাড়িতে ছিল না। আমার অ্যাবসেন্সে শ্যামলরা অনেক কাজ করেছে, যা আমাকে জানায়নি!

ডিসিশন কী নেব সেটা পরে দেখছি। আপাতত বাড়ির ভেতরে যেতে হবে। আমি পা চেপে চেপে মহিলার ঘরটা পার হয়ে গেলাম। গার্ড আমাকে দেখতে না পায়, সেটা খেয়ালে রাখতে হচ্ছে। সিঁড়ির ধাপে পা রেখে পেছনে তাকালাম। লনের আলোতে বাইরেটা

ভারি নিঝুম দেখাচ্ছে। সব কিছু বাইরে থেকে শান্ত, স্বাভাবিক। ভেতরে রক্তের ঢেউ ওঠার আয়োজন চলছে সুভদ্র! বি সিরিয়াস।

সিরিয়াস? আমি কি সিরিয়াস ছিলাম না? এখনও কি নই? হা হা হা! এই মহিলাকে পাহারা দেওয়ার কোনও দরকার নেই। একে আমি সামলাতে পারব না? এর জন্য রাঘবকে সুপারি দিতে হবে? ওহ! হাসি পাচ্ছে। খুব জোরে হেসে উঠলাম। একটা না খেতে পাওয়া আধ বুড়িকে পাঠিয়েছিস আমাকে পাহারা দিতে? হা হা হা হা! উফফ। এবারে জাস্ট ছেড়ে দেব শরীরটা বিছানায়। তার আগে নিজে হাতে সব দরজা, জানালা বন্ধ আছে কিনা দেখে নেব। হুই বুড়ি, ঘুমিয়ে নে আজ।

৩৬

সকালটা হলই অদ্ভুত ভাবে। মনে হল কেউ আমাকে ডাকছে। অনেকদূর থেকে ডাকলে যেমন ভাবে আওয়াজটা আসে, ঠিক তেমন করে আসছে আওয়াজটা। কিন্তু আমাকেই ডাকছে। কে এল এসময়ে! আমার তো আত্মীয় স্বজন, ভাই বন্ধু কিস্যু নেই। আমাকে ডাকবে এমন কেউ তো ...না, উঠে দেখতে হচ্ছে!

নিজেকে না গুছিয়েই দরজা খুলে ফেলেছি। বাইরেটা হা হা করছে। কোথাও কেউ নেই। তাহলে কি স্বপ্ন দেখলাম? তাছাড়া এখনও ভোর হয়নি। একটুখানি আলো ছড়িয়ে আছে আকাশ জুড়ে। কালো মেয়ের গালে লালচে আলো পড়লে যেমন হয়! এমন সময়ে কে আমাকে ডাকবে! কী যে সব স্বপ্ন! মাথা মুন্ডু নেই। দরজা বন্ধ করে ঘরে ঢুকে পড়লাম।

ফের বিছানায় ঢুকেছি। শীত করছে। এসি অফ করে ফ্যান চালিয়ে দিলাম। একটা চাদর... এই যে। নিজেকে জড়িয়ে নিলাম আষ্টেপৃষ্ঠে। ঘুমবো। কিন্তু চোখ বন্ধ করতেই সেই ডাকটা শুনতে পাচ্ছি। কার ডাক শুনতে চাই আমি? আমার মনের ভেতর থেকে কেউ যেন ডেকে উঠেছে। কিন্তু সেই কেউ আমাকে ডাকবে কেন? কে বা ডাকবে? শ্যামল? নিখিল? তৃণা? ঝট করে তন্দ্রা ভেঙে গেল। ওরা ডাকবে কেন? মরে গেছে সব ক'টা! বাজে স্বপ্নটা এসে আমাকে এলোমেলো করে দিতে চেয়েছে। ঘুম হবে না। বরং কফি মেকারে কফি বানিয়ে খাই। কফির মগ হাতে নিয়ে ডিভানে বসলাম। গরম তরল পেটে যেতেই চনমন করে উঠল শরীর। আজ বহুদিন পরে তৃণাকে মনে পড়ল। যৌবনের ফুল ফুটিয়েছিল তৃণা। কত স্বপ্নের ভেতরে ছিলাম তখন। কিন্তু ও পেট বাঁধিয়ে বসেই ঝামেলার সৃষ্টি করল। আমার তখন কি এমন বয়স? জীবন জাস্ট শুরু করছি। বলতে গেলে জীবনের সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রেখেছি। এখনই পড়ে যাব? এখনই নেমে পড়বো? পারলাম না তৃণার কান্নায় গলে যেতে। পালিয়ে গেলাম ওর জীবন থেকে।

নাঃ! অতীতে ঘোরাঘুরি করে লাভ কী? বর্তমানে আসতে হবে সুভদ্র। অনেকদিন ক্লাস নাওনি। ছুটিতে আছো। জয়েনিং ডেট পরশু। হোম ওয়ার্ক করে নিতে হবে। থার্ড ইয়ারের ক্লাসগুলো নিয়ে স্বস্তি। পড়াশোনা করে আজ সময় কাটাবো। শপিং আছে কিছু। মহিলাকে নিয়ে যাব ভাবছি। ওর পেট থেকে কথা আদায় করতে হবে। একটু ভাল শাড়ি, টাকা... এসবই তো আসল টান এই শ্রেণির। অসুবিধে নেই লোভীদের নিয়ে। নির্লোভকে নিয়ে হয় ঝামেলা। যেমন নিখিল ছিল। এই মহিলাকে রাঘবের হাতে দিয়ে দিলে কেমন হয়?

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল বেলায়। ন'টা বেজে গেছে। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। আমাকে কেউ ডেকে দেয়নি! ভাবতেই মনে পড়ল ডেকে দেওয়ার লোক কোথায়? যখন ডেকেছিল, তখন সেটা ছিল স্বপ্ন।

দরজা খুলে হাঁক পাড়তেই মহিলা পড়িমরি করে উঠে এল —চা আনবো?

—স্নান করবো। তুমি চা রেডি কর। বাইরে বের হওয়ার প্ল্যান যে আছে, সেটা প্রকাশ করলাম না। আরাম করে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করে নিলাম। চটপট বেরিয়ে দেখি মহিলা চা সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চায়ে চুমুক দিয়ে খবরের কাগজে চোখ বুলোতে বুলোতে বললাম —রেডি হয়ে নাও। বের হতে হবে আমার সঙ্গে। কিছু কেনাকাটা আছে।

মহিলা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জোরে বলতেই তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে এল। শাড়ি চেঞ্জ করেছে। কানে ইমিটেশন দুল পরেছে। বাঃ, বেড়াতে যাওয়ার শখ আছে দেখছি! মনে কোনও চাপ নেই? খুশি হয়েছে বেড়াতে যাওয়ার নামে!

আজ ফের একই ঘটনা ঘটল। কেউ আমার নাম ধরে ডেকেছে! মনে হচ্ছে কেউ জেনেশুনে আমাকে হ্যারাস করছে। বিব্রত করছে! ভয় পাইয়ে দিতে চাইছে! রাতে কোল্ট রিভলবারটা বের করে বিছানায় রাখলাম। মন কু ডাকছে। এরকম হয়নি কখনও। আমার কি ডাক্তার দেখানো দরকার? যে ডেকেছিল, তার গলার স্বরটা চেনা ঠেকল কি? এমন হতে পারে আর কারও নাম সুভদ্র হতে পারে! আজ ভোরে তাহলে কে ডেকেছিল সুভদ্র বলে? সত্যি কি ডেকেছে?

গাড়ির পেছনে বসে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। গাড়ি পাব পেরিয়ে সোজা যাচ্ছে শপিং মলের দিকে। ঝাঁ চকচকে রাস্তা, দোকানপত্র দেখে মহিলার পলক পড়ে না যেন। এস্কিলেটরে চাপিয়ে হাত ধরে টেনে এনে দাঁড় করাতেই দেখি মুখ ভয়ে বিবর্ণ। শাড়ির দোকান দেখে যথার্থ হাঁ হয়ে গেল। পছন্দ করতে বলতেই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। আমি ওর পছন্দের ধারা বুঝে ছয় খানা শাড়ি কিনে দিলাম। ভাল খাবার, আলো ঝলমল রেস্তরা। কেনাকাটা করছি, কে যেন ডেকে উঠল —অ্যাই সুভদ্র! আমার হাত থেকে চিজের প্যাকেট পড়ে গেল। না, কেউ নেই আমার কাছে পিঠে নাম ধরে ডাকার মতো! কে বারবার চমকে দিচ্ছে! এত ভুল শুনছি?

শপিং সেরে ফিরছি, মহিলাকে আলতো জিজ্ঞাসা করলাম —কেমন লাগল আজ বেড়াতে?

—ভাল বাবু। এত শাড়ি... এত...! কী বলবে বুঝতে পারছে না জানি। এখন পেছন ফিরে তাকালাম —কাল রাতে কোথায় গিয়েছিলে? ডেকে ডেকে পাইনি! গাড়ি থামালাম। ওর সঙ্গে কথা আছে।

মহিলা তীব্র ভয় পেয়েছে —আমি মানে আমার মেয়ের কাছে গিয়েছিলাম।

—অত রাত করে?

—ও ফোন করেছিল, আমার জামাইয়ের অসুখ। তাই ওষুধ কিনা দিয়া আসছি।

—আমাকে বললেই পারতে! কী অসুখ?

—বারে বারে জ্বর আসে।

—বেশ। কাল নিয়ে যেও আমাকে। ডাক্তার দেখিয়ে দেব।

মহিলা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। কিন্তু আড়ে আড়ে আমাকে দেখছিল —বাবু, রাগ কইরেন না। না বইলা গেছি।

—ঠিক আছে।

মহিলাকে বাড়ির ভেতরে রাখার ব্যবস্থা করে দিলাম। এভাবে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে জানি না। আমার নিজেরও নিরাপত্তার ব্যাপার আছে।

মহিলার মধ্যে কোনও হেলদোল দেখলাম না। হয়তো সত্যি মেয়ের বাড়িতে গিয়েছিল। আজ ফের একই ঘটনা ঘটল। কেউ আমার নাম ধরে ডেকেছে! মনে হচ্ছে কেউ জেনেশুনে আমাকে হ্যারাস করছে। বিব্রত করছে! ভয় পাইয়ে দিতে চাইছে!

রাতে কোল্ট রিভলবারটা বের করে বিছানায় রাখলাম। মন কু ডাকছে। এরকম হয়নি কখনও। আমার কি ডাক্তার দেখানো দরকার? যে ডেকেছিল, তার গলার স্বরটা চেনা ঠেকল কি? এমন হতে পারে আর কারও নাম সুভদ্র হতে পারে! আজ ভোরে তাহলে কে ডেকেছিল সুভদ্র বলে? সত্যি কি ডেকেছে?

মহিলাকে ডেকে ব্যালকনিতে জল রেখে যেতে বললাম। আচ্ছা, মহিলার নাম কী? এভাবে 'এই যে' বলে সম্বোধন করা অসুবিধের। আজ ওয়াইন খাব। বৃষ্টির বাতাস দিচ্ছে মানে কাছেপিঠে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে।

গুছিয়ে বসেছি, মহিলা কাচের জারে জল নিয়ে এল। জল রেখে চলে যাচ্ছে, ডাকলাম —তোমার নাম কী?

—সরলা। সরলা বণিক।

—বেশ। খেয়েছ?

—হ্যাঁ। যাও। ঘুমিয়ে পড়ো। দরকার হলে ডাকবো বুঝলে? ওই জন্যই তোমাকে ভেতরে এনেছি। কখন দরকার হয়! একা থাকি।

আজ সিঁড়ির মুখে কোলাপসিবল এঁটেছি। তালা মেরেছি নিজের হাতে। এমনিতে তালা লাগাতে ভাল লাগে না। আজ নিজেই লাগালাম। পেছনে ফেউ ডাকছে। সাবধানের মার নেই। খুবই পুরনো কথা। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি কথাটা।

সরলা চলে গেছে। ওর ঘরের দরজা বন্ধ হল শুনতে পেলাম। আস্তে আস্তে ওয়াইন খাচ্ছি। ভেতরে গান আসছে। ওয়াইন খেলেই মন ভারি ফুরফুরে হয়ে যায় আমার। রুক্মিণীকে মনে পড়ছে। হাপিস হয়ে গেল একেবারে। একটা ফোন করি?

রিং হতে হতে বন্ধ হয়ে গেল। কোথায় কার চক্করে পড়ে কী করছে, কে জানে! আজকের এই ওয়েদারে রুকুর বুকে, ঘাড়ে মুখ ঘষতে ইচ্ছে হচ্ছে। ওহ রুক্মিণী!

(ক্রমশ)

স্কেচ: দেবরাজ কর

ডুয়ার্স থেকে শুরু

সব চরিত্র কাল্পনিক

বাংলায় আবার লেগেছে ভোটের হাওয়া। চলছে রং বদলানোর স্বপ্ন দেখা। লাল থেকে হয়েছে নীল-সাদা, কোথাও কোথাও উঁকি মারছে গেরুয়া। বাদ যায়নি ইস্কুলের রং-ও। রং বদলে এককালের বরেণ্য নেতারা নায়ক থেকে হয়ে উঠেছেন খলনায়ক। আজকের বলিউডি সিনেমা তাঁদের খলনায়ক ছাড়া অন্য কোনও ভূমিকায় দেখতে নারাজ। যদিও শুরুটা হয়েছিল অনেক আগে ১৯৬৪ সালে, লিডার সিনেমা দিয়ে। '৬২ চিনা থাপ্পরে নেতাদের সম্পর্কে চোখ খোলে দেশবাসীর। আর আছেন ঘটু মল্লিক 'বাংলা চর্চায়' যিনি সিদ্ধহস্ত। ঘটুবাবুর মতে বেকার জিনিস এই ভোট। বড় বড় মণীষীরা কখনও ভোটে দাঁড়াননি, আঙুলে কালি লাগাননি, তাই তাঁরা বেঁচে গেছেন। তাই আজও তাঁদের ছবি দিয়ে ক্যালেন্ডার হয়। এই পর্বে লেখক তুলে ধরেছেন তার স্মৃতি।

লালবাজারেরও নীলবাজার হতে আর বেশি দেরি নেই, বুয়েছেন মশাই?

একটি তীক্ষ্ণ এবং আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠস্বর জোর দিয়ে এই আসন্ন নির্ঘণ্টটি ঘোষণা করলো। এবং তার সঙ্গে পাদটিকা স্বরূপ জুড়ে দিল আরো দুটি বাক্য, দেখছেন না ভারতী ঘোষের কি হাল? তারপরে তো আপনার আর সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়!

উগ্র স্বরের এই প্রচণ্ড তর্কে, আপাততঃ একজন ব্যক্তির কণ্ঠই শোনা যাচ্ছে। আর যাকে উদ্দেশ করে বলা, জবাবে তিনি হয়তো পাল্টা কিছু ফুট কাটলেন। কানে শোনা না গেলেও নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে সেটা ফুট কাটা-ই। নয়তো, আরও তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে, প্রথম লোকটা সরু স্বরে কেন চ্যাঁচাবে? চেঁচিয়ে উঠে গোটা বিশ্ব সংসারকে সে জানান দিল, হ্যাঁ হ্যাঁ... আমিই বলছি। ...রং বদলাবেইইইইইই!

আমরা তখন মাঝ গঙ্গায়। ফলে তার সে চিৎকার যেন গঙ্গা নদীর দুটি কূলকেই অনায়াসে ছুঁয়ে গেল।

যদিও নদী পারাপারকারী প্রকাণ্ড ভেসেল-টির ইঞ্জিন, এমনিতেই যথেষ্ট মোটাসোটা একটা শব্দের আবহে আমাদের ঘিরে রেখেছিল। কিন্তু সেটা ভেদ করেও যে ওই ব্যক্তির কণ্ঠ রীতিমত স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, সেটা যথেষ্ট বিস্ময়কর। তাই অনেকক্ষণ থেকেই আমার বেশ একটা কৌতূহল হচ্ছিল। লোকটার এমন মাইকের মতো গলা যখন, চেহারাটাও নিশ্চয় ইন্টারেস্টিং হবে!

তবে দেখবো বললেই তো আর দেখা যায় না। ঠাসা ভিড় লঞ্চটিতে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আমরা অন্ততঃ জনা ষাটেক মানুষ। গঙ্গার দিকে তাকালে এ কূল ও কূল যদিও বা দেখা যায়, লঞ্চের ভেতরে চার পাঁচ মানুষ বাদেই দৃষ্টি পথ হারাবে। তাই দেখা হল না। একসময় টিং টিং ঘণ্টি বাজিয়ে লঞ্চ এসে ভিড়লো নৈহাটির জেটিতে। সামনের ভিড়ে কোথাও সেই কণ্ঠের মালিক নীল সাদার গুণগান করতে করতে হারিয়ে গেলেন। তবে যাওয়ার আগে আমায় মনে পড়িয়ে

দিয়ে গেলেন, ক'দিন আগেই দেখা সংবাদপত্রের একটি খবর। জলপাইগুড়ির রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের এত বছরকার পুরনো লাল সাদা রঙ নাকি এবারে নীল সাদা হতে চলেছে!

ওই সংবাদ প্রতিবেদনে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকারও একটি বয়ান ছিল। যেখানে তিনি কোনও বিতর্কে জড়াতে না চেয়ে স্পষ্ট ভাষায় ডিসক্লেমার দিয়ে দিয়েছেন। যার মোদ্দা মর্মার্থ হল, রং নিয়ে যা সিদ্ধান্ত হয়েছে তার যাবতীয় দায়ভার সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের। তার ঘাড়ে মোটেও একাধিক মাথা নেই, যে এর বেশি কিছু বলতে যাবেন।

খবরটি পড়া মাত্রই প্রথম যে কথাটি মাথায় এসেছিল, তা হল... স্কুল বাড়ির নতুন রঙের সাথে মানানসই করার জন্য, এরপরে স্কুল ইউনিফর্মের রং নিয়ে টানাটানি পড়বে না তো? সেটাও যে লাল সাদা!

অবশ্য তখন মনে পড়ল, সেখানে নীল প্রচলন করায় একটি বিশেষ টেকনিক্যাল বাধা আছে। কারণ সেক্ষেত্রে আবার জলপাইগুড়ি সদর গার্লস স্কুলের ইউনিফর্মকে বিবেচনায় রাখতে হবে। নয়তো নীলে নীল মিলে, একটা বড় রকমের কনফিউশান পাকিয়ে উঠতে বাধ্য!

'কাঙাল মালসাট' সিনেমায় কবীর সুমন অভিনীত চরিত্রের মুখে একটি জব্বর সংলাপ আছে... 'ঝিনচ্যাক ছাড়া আর কিছুই থাকবে না!' একটু ভেবে দেখলে, আজকাল জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই ওই সংলাপ একেবারে অক্ষরে অক্ষরে লাগসই। সে আপনি রং নিয়ে রংবাজির কথাতেই ধরুন কি পঞ্চায়েত ভোটে মনোনয়ন দাখিলের ক্যালাকেলিতে! উপরোক্ত দুইয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে, প্রায় ফাঁকা ময়দানে, কিঞ্চিত গেরুয়া হালুম এ বছরে মালুম হচ্ছে বটে। কিন্তু ব্যালট বাক্সে, সেটা হামেশাই লালগড়ের বাঘটির মতো গায়েব প্রমাণিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই দ্রষ্টব্য, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাসমান একটি ভাইরাল কার্টুন। যেখানে সরকারি ভোট কর্মীরা জনৈক দাপুটে নেতার কাছে সকাতরে আবেদন করছেন— স্যার সারা বাংলাকেই বীরভূম ক্যাপসুল খাইয়ে ভোট মুক্ত করুন না প্লীজ! আমরা বেচারিরা তবে ডিউটির জ্বালা থেকে মুক্তি পাই!

ভোটের নানান দিক আছে। এক একজন যা এক এক ভাবে দেখবেন। আমার কাছে যেমন বেশ ধাঁধার মতো লাগে ভোটের ফলাফল সংক্রান্ত বহুল ব্যবহৃত দুটি বয়ান। এক নম্বর হল...'নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিপুল ব্যবধানে পরাজিত করে অমুকে জয়ী হয়েছেন'। আর দ্বিতীয়... 'এই আসনে পরাজিত হলেও এবারের ভোটে বিরোধী পক্ষ ব্যবধান অনেক কমিয়ে ফেলেছেন'।

জয় পরাজয় নির্বিশেষে আমার কাছে মূল ধাঁধা হল এই 'ব্যবধান'। ব্যবধান কমে এলে কি দুই পক্ষে মিত্রতা বেড়ে ওঠে? আর বাড়লে বুঝি একেবারে মুখ দেখাদেখি বন্ধ? পোড় খাওয়া বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলবেন, ভোটরঙ্গ বড় বিচিত্র জিনিস। এখানে দোস্তি বা দুশমনি অনেক ক্ষেত্রেই শর্ত সাপেক্ষে নির্ধারিত হয়। যেমন, প্রার্থী হয়তো জিতে এলেন এক দলের ঘাড়ে চেপে। কিন্তু ক্ষমতার সমীকরণে বিশেষ কিছু সুবিধা পাওয়া মাত্রই, অবলীলায় অন্য দলে টুয়েলফথ ম্যান হয়ে তিনি ঢুকে পড়তেই পারেন। এই রং বদল আজকাল একেবারে জলভাত, গা সওয়া হয়ে যাওয়া ব্যাপার। কারণ, কার্যতঃ পলিটিক্সও এখন জবরদস্ত একটি কেরিয়ার। যেখানে ছোটো বা মাঝারি গোছের নেতা হতে পারা মানেই অবধারিত সমৃদ্ধি। আর তাছাড়া দিনকালটাই এমন পড়েছে, যে অতি সাধারণ আটপৌরে

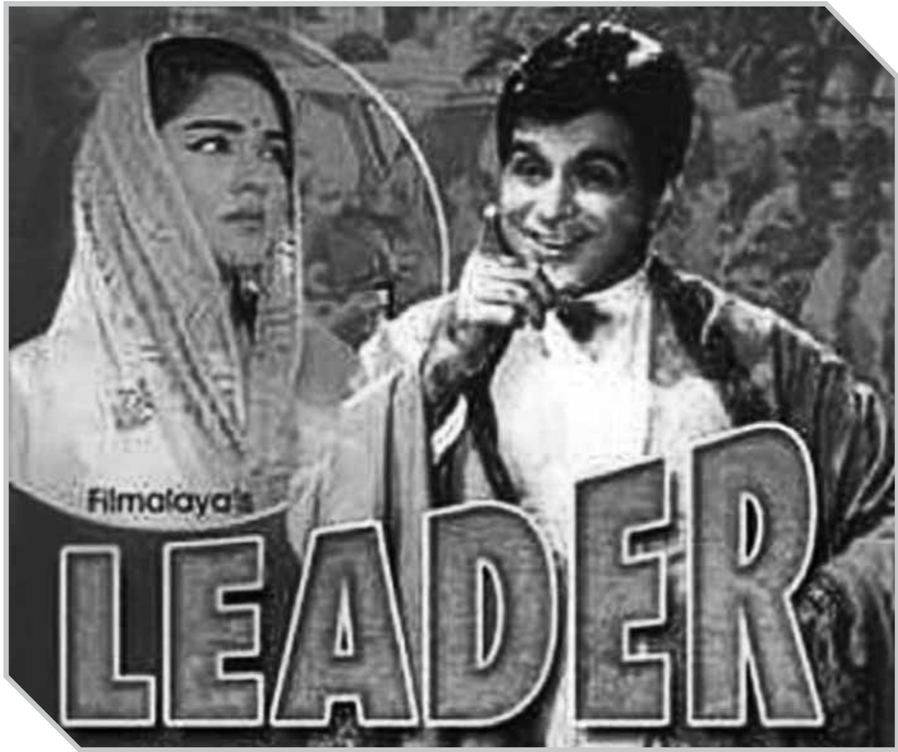

১৯৬৪ সালে রিলিজ হওয়া 'লিডার' ছবিতেই সম্ভবতঃ প্রথমবার ভারতের ইলেকশনকে সিনেমার পর্দায় নিয়ে এসেছিল বলিউড। '৬২ সালের ভারত চিন যুদ্ধ পরবর্তী সেই সময়ে দেশের অধিকাংশ মানুষ, ওই যুদ্ধের অসম্মানজনক পরাজয়কে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। ফলে কংগ্রেস দল এবং বিশেষতঃ নেহেরু নীতির ব্যর্থতা নিয়ে তারা সরব হওয়া আরম্ভ করেছিল। দেশের সরল সাদা মানুষের চোখে সেই প্রথম ধরা পড়ে যাচ্ছিল, যে নেতাদের প্রতিশ্রুতি আর বাস্তব কর্মপন্থায় বিস্তর ফারাক আছে।

লাইফ স্টাইলের নেতা হয়ে জীবন কাটালেও যে জনগণ তাকে বিশেষ নেক নজরে দেখবে এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। ত্রিপুরায় মানিক সরকারের ভরাডুবি যার একেবারে হাতে গরম জলজ্যান্ত প্রমাণ!

যাক গে, অত ভারী কথার কচকচিতে ঢুকে কাজ কি? আমাদের ভারতবর্ষে, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সব চেয়ে সোজা সরল যে আয়নাটি রয়েছে, একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখি চলুন। হ্যাঁ, আমি বলিউড সিনেমার কথা বলছি। সেখানে আপনি সাধারণ মানুষের দেশাত্মবোধ নিয়ে ভুড়িভুড়ি কাহিনি দেখতে পাবেন। শিক্ষক, পুলিশ, সৈনিক, ল-ইয়ার, ডাক্তার, গণিকা... ইত্যাদি যাবতীয় পেশার নায়ক বা নায়িকা পাবেন। কিন্তু যতোই খুঁজে দেখুন, সেখানে নেতা মাত্রেই অবধারিত ভাবে মার্কামারা খলনায়ক! তলিয়ে ভেবে দেখলে এর একটিই কারণ দর্শানো যায়। বলিউড তো জনমনোরঞ্জন করার জন্য সিনেমা বানায়। অর্থাৎ, পাবলিক যা 'খায়', সেটাই সিনেমাতে দেখায়। সুতরাং মানেটা এই দাঁড়ালো, যে নেতাকে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় দেখতেই এই দেশের জনতা সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে।

১৯৬৪ সালে রিলিজ হওয়া 'লিডার' ছবিতেই সম্ভবতঃ প্রথমবার ভারতের ইলেকশনকে সিনেমার পর্দায় নিয়ে এসেছিল বলিউড। '৬২ সালের ভারত চিন যুদ্ধ পরবর্তী সেই সময়ে দেশের অধিকাংশ মানুষ, ওই যুদ্ধের অসম্মানজনক পরাজয়কে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। ফলে কংগ্রেস দল এবং বিশেষতঃ নেহেরু নীতির ব্যর্থতা নিয়ে তারা সরব হওয়া আরম্ভ করেছিল। দেশের সরল সাদা মানুষের চোখে সেই প্রথম ধরা পড়ে যাচ্ছিল, যে নেতাদের প্রতিশ্রুতি আর বাস্তব কর্মপন্থায় বিস্তর ফারাক আছে।

'লিডার' সিনেমায় দিলীপকুমারের লিপে এবং মহম্মদ রফির গলায় বিখ্যাত সেই গানটা মনে পড়ে? 'মুঝে দুনিয়াবালোঁ, শরাবি না সমঝোঁ...ম্যায়ঁ পিঁ তা নহিঁ হুঁ...পিলায়িঁ গ্যায়ী হুঁ...'। চাইলেই কিন্তু এই লিরিকের বিটউইন দ্য লাইনস একটা আলাদা মানে বার করে নেয়া যায়। কারণ, ভোট মত্ত ভারতে, এক অর্থে সাধারণ ভোটারের দশা অনেকটাই এরকম। সমস্ত পার্টির কাছেই এখন ভোটে জেতা এবং ক্ষমতায় আসা এতটাই জরুরি, যে সোজা আঙুল বাঁকা করার ব্যাপারে এ দেশে কেউই আজ আর ধোয়া তুলসীপাতা নয়। তাই আম জনতা হিসেবে একজন মানুষ যদি মনে করেন যে দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে তার ভোটটা বিরাট কোনও ফারাক গড়ে দিতে পারে, সেটা হবে নিছকই আকাশকুসুম কল্পনা। কারণ আসলে ভোটে কে জিতবে আর কে হারবে, ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রেই তো সেটা স্থির করে দেয় ভোট মেশিনারি। যে মেশিনারি আবার চিরকাল কোনও এক দলের বংশবদ কখনোই থাকে না। একই যন্ত্র কখনো এই পক্ষের ফেভারে তো কখনো ওই পক্ষের!

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {21cm (W) X 28 cm (H)}, Non Bleed {18cm (W) X 25 cm (H)}, Half Page Horizontal {18 cm (W) X 12 cm (H)}, Vertical {8.5 cm (W) X 25 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5.6 cm (W) X 25 cm (H)}, Horizontal 18 cm (W) X 6.5 cm (H), 1/4 Page 8.5 cm (W) X 12 cm (H), 1/6 Page {5.75 cm (W) X 12.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2018 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

সুতরাং সাধারণ ভোটার তো বলতেই পারে 'ম্যায়ঁ পিঁ তা নহিঁ হুঁ, পিলায়িঁ গয়াঁ হুঁ!'

'লিডার' সিনেমার কথায় ফেরা যাক। নায়ক দিলীপ কুমার সেখানে উগ্র স্বভাবের এক আইনের ছাত্র। যে সর্বদা সরকারের সমালোচনায় মুখর। এবং ইলেকশনের আগে তাকে থামাতে, সুকৌশলে একটি মিথ্যে খুনের মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে, সেই মহাভারতের সময়কার শকুনি মামার চোরাগোপ্তা কায়দাকানুন যে ডেমোক্রেসিতেও যথেষ্টই লাগু, বলিউড সেই প্রথমবার তার একটা ইঙ্গিত দিয়ে দিল। আর তারপর থেকেই দেখা যেতে লাগলো যে আগেকার সিনেমায় যেখানে জোতদার বা জমিদাররা একচেটিয়া ভিলেন ছিলেন, সেই জায়গা এবার থেকে দখল করে নিতে লাগলেন বিত্তবান ব্যবসায়ী বা রাজনৈতিক নেতারা। এবং এটা মানতেই হবে যে গান বা অ্যাকশন দৃশ্যে অনেক অবিশ্বাস্য কারসাজি দেখানোর বদনাম থাকলেও, তখনকার বলিউড সিনেমা ভিলেন নির্বাচনের ব্যাপারে কিন্তু বাস্তব আর সিনেমায় বিশেষ ফারাক রাখেনি। সিনেমাতে নেতাদের যা সব কীর্তিকলাপ দেখা যেতো (এবং এখনো দেখা যায়) তা কিন্তু একটু নজর করলেই রোজকার খবরের কাগজেও আপনি আলবাত দেখতে পাবেন। এবার তবে প্রশ্ন উঠতেই পারে যে এই ক্ষেত্রে তবে কে কার দ্বারা অনুপ্রাণিত? কাহিনির দ্বারা বাস্তব না বাস্তবের দ্বারা কাহিনি?

"বেকার জিনিস, এই ভোট। কেন ভোট দিতে নেই, শুনবি? তবে শোন, আমি বলছি। স্বামী বিবেকানন্দ কোনওদিন ভোট দিয়েছে? দেয়নি। রবীন্দ্রনাথ? মহাত্মা গান্ধি? শুনেছিস? এদের কারোর আঙুলে ভোটের কালি লেগেছে বলে শুনেছিস, বল? সুভাষচন্দ্র বোস... ভগত সিং... না থাক, আর নাম বলব না। তোরা চিনতে পারবি না ভাই। যেটা হল কথা... আসল কথা যেটা বলছি... এই সব বড় বড় মানুষ ভোট দেয়নি কেউ, ভোটে দাঁড়ায়নি কেউ। বেঁচে গেছে!"

সিরিয়াসলি বলছি, উত্তর খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। কারণ প্রশ্নটা একেবারে নিখাদ 'ডিম আগে না মুরগি আগে' গোত্রের!

আবার মনের ভেতরে বেজে উঠলো রফি সাহেবের কণ্ঠ। এবং আবারও ওই একই গান...'মুঝে দুনিয়াবালোঁ...'

কিন্তু না...দাঁড়ান, দাঁড়ান...মহম্মদ রফি নয়, এ তো ঘটু মল্লিকের বেসুরো গলা। রাত একটু ঘনালেই কলকাতা কর্পোরেশনের লাল বাড়ির সামনের অন্ধকার ফুটপাথে এক একদিন বসে থাকতে দেখি এই ঘটু মল্লিককে। অনেক ভিখিরিদের রাতের ডেরা ওই ফুটপাথ এবং তৎসংলগ্ন বাস শেল্টার। ভিখিরিদের কেউ কেউ হাঁড়িতে ভাত চাপিয়ে নৈশাহারের তোড়জোড় করছে। কেউ বা ডিমের ক্রেট পুড়িয়ে মশা তাড়ানোর বন্দোবস্ত করছে। খানিক বাদেই খেয়ে দেয়ে, সবাই তারা ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় নেড়ি কুকুরদের সাথে টান টান হয়ে শুয়ে পড়বে। আর এসবের মাঝেই এক আবছায়া মূর্তি রূপে ঘটু মল্লিককে দেখা যায়। রোজ নয় অবশ্য। শুধু যে সব দিনে, যেদিন সে তার মফঃস্বলের বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় চলে আসে। এবং তারপর এই কর্পোরেশন বিল্ডিং-এর সামনে, একখানা থান ইটের ওপর গুছিয়ে বসে শুরু হয় তার আসর। আসর সঙ্গী, সামনে দাঁড় করানো খান দুই চকচকে 'দাদা' কিংবা 'জোশ' ব্র্যান্ডের বাংলা দারুর প্লাস্টিক বোতল। আর গলা দিয়ে গড়িয়ে বেরনো রফি সাহেবের প্রেত স্বর।

জনশ্রুতি বলে, ঘটু মল্লিক নিজের এলাকার কোনও ভাঁটিখানায় ঢোকার ছাড়পত্র পায় না আজকাল। কারণ হল তার স্ত্রী, যিনি একটি মারমুখো মহিলা সমিতির জাঁদরেল নেত্রী। যে সব ভাঁটিখানায় ঘটু মল্লিকের পায়ের ধুলো পড়তো, কিছুদিনের মধ্যেই নাকি সেখানে মহিলা সমিতির আক্রমণ একটা অনিবার্য ব্যাপার ছিল। এবং সেই আক্রমণ চলাকালীন, মহিলাদের ঝাঁটা, ভাঁটির মালিক ও খদ্দেরদের ওপর একদম সমানুপাতে বর্ষিত হত। সুতরাং ঘটু মল্লিক যে অচিরেই ভাঁটিগুলোয় ব্যান হয়ে যাবে এতে আর আশ্চর্য কীসের!

এবার তাই, এলাকা থেকে অনেক দূরে শান্তিতে বাংলার চর্চা করতে, ঘটু মল্লিক এই ঠিকানা খুঁজে নিয়েছে। কাছাকাছির মধ্যে বারোদুয়ারি এবং খালাসিটোলার মতো দু'খানা স্মরণীয় স্থান থাকতেও, ঘটুবাবুর বিশেষ পছন্দ এই কর্পোরেশন বিল্ডিং। এবং, একটি বিশেষ কারণে। বাংলা মুখে দেয়ার আগে প্রতিবার কর্পোরেশনের বন্ধ গেটের কাছে মাটিতে সে একবার কপাল ঠেকিয়ে আসে। যেহেতু ওই পথ দিয়েই ১৯৩০ সালের মেয়র নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস তার দপ্তরে যেতেন। আহা! কী সব সৎ ব্যক্তি ছিলেন প্রথম দিককার এক একজন নমস্য মেয়র।

অনেকগুলো বাংলার বোতল আত্মস্থ করে নেয়া ঘটুবাবু একদিন ভিখিরিদের ভোটের ক্লাস করাচ্ছিল, আমি বাসস্টপে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম।

—বেকার জিনিস, এই ভোট। কেন ভোট দিতে নেই, শুনবি? তবে শোন, আমি বলছি। স্বামী বিবেকানন্দ কোনওদিন ভোট দিয়েছে? দেয়নি। রবীন্দ্রনাথ? মহাত্মা গান্ধি? শুনেছিস? এদের কারোর আঙুলে ভোটের কালি লেগেছে বলে শুনেছিস, বল? সুভাষচন্দ্র বোস... ভগত সিং... না থাক, আর নাম বলব না। তোরা চিনতে পারবি না ভাই। যেটা হল কথা... আসল কথা যেটা বলছি... এই সব বড় বড় মানুষ ভোট দেয়নি কেউ, ভোটে দাঁড়ায়নি কেউ। বেঁচে গেছে! এখনো তাই এদের ছবি দেয়া ক্যালেন্ডার ছাপা হয় বুঝলি! ভোটের কালিতে এরা কেউ কালো হয়নি বলে!

রংচং মাখা এক দঙ্গল ছেলে মেয়ের দল ওদের পাশ দিয়ে হই হই করে চলে গেল ইডেন গার্ডেনসের দিকে। আজ আইপিএল ম্যাচ। কলকাতা নাইট রাইডারস!

আসন্ন ভোটেও খানিক ওরকমই উৎসবের হাওয়া ঠাহর হয় যেন। ঘটুবাবুর আপ্তবাক্য বাংলার কিছু কিছু অঞ্চলে এখন রীতিমত গুরুত্ব সহকারে পালিত হচ্ছে। কারণ বিরোধীর অভাবে সেখানে ভোটেরই আর দরকার পড়ছে না। মাথায় হাত পড়েছে দেয়াল অঙ্কন শিল্পী বা ফ্লেক্স ও পোস্টার ছাপানোর ছাপাখানায়। ভোট উৎসবের ব্যবসাটাই মার যেতে বসেছে তাদের। বিরোধীই নেই যখন, তবে আর কীসের জন্য ভোটের প্রচারে খরচ করতে যাবে প্রার্থীরা? A penny saved is a penny earned!

অভিজিৎ সরকার

(ক্রমশ)

অবলুপ্তির পথে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী লোকক্রীড়া ?

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী বা কোচ-রাজবংশীদের লোকজীবনে প্রাচীন কাল থেকে যে সব খেলাধুলা বংশানুক্রমিকভাবে প্রচলিত, সেই খেলাধুলাকেই লোকসংস্কৃতির ভাষায় রাজবংশী জাতির লোকক্রীড়া বা লৌকিক ক্রীড়া বলা হয়। এই খেলাগুলি একসময় ছিল বিনোদনের অংশমাত্র। কিন্তু পরবর্তীতে কিছু খেলা হয়ে উঠেছে 'এথনিক আইডেনটিটি' অর্থাৎ জাতিগত পরিচয়

শারীরিক সক্ষমতা গড়তে, মনে ঐক্যের ভাব সৃষ্টিতে, সাজিকীকরণে, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায়, সাহস ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিতে লোকক্রীড়ার গুরুত্ব অপরিসীম। লোকক্রীড়া বেঁচে থাকে প্রতিদিনের অভ্যাসের উপর, অভ্যাস ব্যহত হলে ক্রীড়া সংস্কৃতির পরিবর্তন আসাটা স্বাভাবিক। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার প্রতি অতিরিক্ত উৎসাহের ফলে মানুষ সেইসব খেলা ভুলে যাচ্ছে। এই রচনায় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির লুপ্তপ্রায় লোকক্রীড়াগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরার প্রয়াস করা হল।

রাজবংশী লোকসমাজ প্রচলিত লৌকিক বা লোকক্রীড়াগুলিকে মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

লৌকিক ঘরোয়া খেলা (ইনডোর গেম)
মুক্তাঙ্গণ ক্রীড়া (আউটডোর গেম)
জল ও গাছের খেলা
পূজা-পার্বণ ও আনুষ্ঠানিক লোকক্রীড়া।

রাজবংশী জাতি একটি বৃহৎ অঞ্চলে বসবাস করার দরুন স্থানভেদে খেলাগুলির কিছুটা পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। আবার স্থানভেদে একই খেলার একাধিক নাম ও একাধিক আইন-কানুন পাওয়া যায়। রাজবংশী লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত লৌকিক ক্রীড়া বা লোকক্রীড়ার অনেক খেলাই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং কিছু কিছু লেখা অবলুপ্তির মুখে।

লৌকিক ঘরোয়া খেলা

ছড়ামূলক খেলা

রাজবংশী লোকক্রীড়ায় প্রচলিত ছড়ামূলক খেলাগুলি লোকসংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। বিশ্বের অন্যান্য লোকসংস্কৃতিতেও এই ছড়ামূলক লোকক্রীড়ার নজির রয়েছে। রাজবংশী লোকক্রীড়ায় যে ছড়ামূলক খেলা দেখা যায়, তেমন কয়েকটি খেলা হল—

ক) নোট করে নটুয়া— খেলার ছড়াটি নিম্নরূপ

'নোট করে নটুয়া
ভইসের খটুয়া
ভইসের ত্যালে
বারো বাতি জ্বলে
জ্বল্লুক বাতি পড়ুক ত্যাল
আমখড়িখান পাকা ব্যাল (বেল)
পাক্কা না কাঁচা
দে একটা ছিড়িয়া—
ভুটুলুস।'

এটি রাজবংশী শিশুদের একটি প্রিয় ছড়ামূলক খেলা। মূলত সন্ধ্যার সময় ঠাকুমা বা ঠাকুর্দা নাতি-নাতনিদের নিয়ে এই খেলা খেলেন। শিশুরা মাদুর বা অন্য কোনও আসনে গোলাকার ভাবে বসে একে অপরে হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল মুঠ করে ধরে 'হাতের স্তম্ভ' তৈরি করে। ঠাকুমা-ঠাকুর্দা বা শিশুদের কেউ উল্লেখিত ছড়াটি উচ্চস্বরে বলে এবং সকলে মিলে হাতের স্তম্ভটি দোলাতে থাকে। ছড়ার শেষ শব্দ 'ভুটুলুস' উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলে হাতগুলি উপরে তুলে 'হাতের স্তম্ভটি' ভেঙে দেয়।

খ) ইচন-বিচন খেলার ছড়াটি হল—

'ইচন বিচন ধাপুরী বিচন
তাতে আছে মঙ্গলকাটা
মঙ্গলকাটা নড়ে চড়ে
আয় কুমারী ডাকপারে
এলেরে বেলেরে
ফুলের মান্ডালা পাত
ছিড়ি আংটি হাত কাট।'

এই খেলাটি সাধারণত মেয়েরাই খেলে থাকে। চার-পাঁচজন বা ততোধিক মেয়ে মাদুরে গোলাকার হয়ে বসে মাদুরের ওপর হাত দুটি উপুর করে পেতে রাখে। তাদের মধ্যে একজন পরিচালক হয়। পরিচালক উল্লেখিত ছড়াটির এক-একটি শব্দ বলে আর পেতে রাখা হাতগুলোর উপর ক্রমানুসারে একটি করে ঘুষি দেয়। এভাবে যে খেলোয়ারের হাতে গিয়ে 'হাত কাট' শব্দ বলা হয়, তার ওই হাতটি উঠিয়ে নিতে হয়। তারপর ডান দিক থেকে সকল খেলোয়াড়কে প্রশ্ন করা হয় যে— 'খাবো না জিয়া থুবো?' যদি উত্তর আসে 'খাম', তাহলে তার হাত কপালে রাখতে হয়। আর যদি উত্তর আসে 'জিয়া' রাখবে তাহলে তার হাত পেট বা নাভিতে রাখতে হয়।

গ) 'ঝেচু-চু' খেলার ছড়াটি হল—

'ঝেচু-চু-চু
বাঁশবাড়িৎ গু
টেউরি আছে নেউরি আছে
কায় ফেলাবে গু?
দাদা গেইসে মাচক
বৌদি জুড়িসে খোলা
বৌদির মাথাৎ অঘুন নাগিসে
বোল্লো - আল্লা-লা।'

রাজবংশী জাতির শিশুদের মধ্যে প্রচলিত ছড়ামূলক খেলাগুলির অন্যতম হল— 'ঝেচু-চু'। এই খেলাতে পাঁচ-ছয় বা ততোধিক খেলোয়াড় থাকতে পারে। প্রথমে প্রত্যেক খেলোয়াড় একে অপরের হাতের উপরে চিমটি কেটে ধরে 'হাতের স্তম্ভ' তৈরি করে। তারপর খেলার পরিচালক ছড়াটি উচ্চ স্বরে বলে এবং ছড়াটি শেষ হওয়ামাত্র হাতগুলো উপরের দিকে তুলে একসঙ্গে ছেড়ে দেয়।

ঘ) 'আদা পাদা' খেলার ছড়াটি হল—

'আদা পাদা নুন খরোদা
একেনা আদা পড়ি পানু
সগারে/সবারে মুখতে বাটি দিনু।
যায় করিবে আও
তারে মুখত খাও।
যায় করিবে থু
তার মুখত গু।
যায় করিবে হোক্কা
তারে মুখৎ পোক্কা।'

শিশুদের এই খেলাতেও পাঁচ-ছয়টি শিশু দুই হাত পেতে রেখে বৃত্তাকারে বসে। একজন শিশু উল্লেখিত ছড়াটি বলার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তাকারে ঘুরবে এবং সব শিশুকে হাতের চেটো দিয়ে স্পর্শ করবে। ছড়াটি যার কাছে গিয়ে শেষ হয়, তাকে 'চোর' ধরা হয়। তারপর সেই 'চোর' পূর্বের খেলোয়াড়ের মতো ছড়াটি বলবে আর ক্রমানুসারে সকলকে স্পর্শ করবে। এটাই 'আদা-পাদা' খেলার নিয়ম। স্থান ভেদে এই খেলার নাম 'তোসর' খেলা।

রাজবংশী জাতির শিশুমনে এরূপ ছড়া জাতীয় লোকক্রীড়ার গুরুত্ব অপরিসীম। ছড়াগুলির শব্দ, ছন্দ ও খেলার ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে শিশু খেলোয়াড়দের মানবিক বিকাশের সূচনা হয়। তবে স্থানভেদে ছড়াগুলিতে কিছু ফারাক দেখা যায়। উল্লেখিত ছড়াগুলি ছাড়াও আরও কিছু ছড়া রাজবংশী লোকসমাজে প্রচলিত ছিল।

নুক্কাটুঁহু (হাইড অ্যান্ড সিক)

রাজবংশী শিশুদের মধ্যে প্রচলিত দক্ষতামূলক এই খেলাটি বাংলা ভাষায় 'লুকোচুরি' নামে পরিচিত। শিশুরা খেলাটি তিন-চার বছর বয়সে পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে খেলে। তবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা নিজেদের মধ্যে খেলাটি খেলে থাকে। শিশুদের মধ্যে একজনের চোখ দুটি গামছা বা অন্য কোনও কাপড় দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত। তারপর খেলার অন্যান্য শিশুরা বাড়ির কোথাও লুকিয়ে পড়ত এবং চোখ বাঁধা চোরকে তাদের খুঁজে বের করার অনুমতি দিত। চোর যে খেলোয়াড়কে প্রথম খুঁজে পায়, সেই পরবর্তী চোর হয়। এভাবেই খেলাটি চলতে থাকে।

কিৎকিৎ

রাজবংশী মেয়েদের জনপ্রিয় খেলা হল কিৎকিৎ। স্থান ভেদে খেলাটির রীতি-নীতির কিছুটা পার্থক্য দেখা যায় বা নানা রূপ দেখা যায়। ভাঙা হাড়ি বা কলসির টুকরো, চ্যাপ্টা-পাতলা পাথর, টালির টুকরো ইত্যাদিকে 'কড়ি' (চাকতি, ডিঙ্গিল, চারা) হিসাবে ব্যবহার করে খেলাটি খেলা হয়। খেলাটি খেলতে ছয় ঘর (বেশিও হয়) বিশিষ্ট একটি আয়তাকার ছকের প্রয়োজন, যা মাটিতে দাগ কেটে তৈরি করা হয়। ছয়টি ঘরের মোট দৈর্ঘ্য আট/নয় ফুট ও প্রস্থ চার/পাঁচ ফুট হয়ে থাকে। শেষ বা ছয় নম্বর ঘরটিকে 'রাজার ঘর' বলে। এই ঘরটি অন্যান্য ঘরের তুলনায় একটু বড় থাকে। দুই বা ততোধিক মেয়ে একসঙ্গে খেলাটি খেলে থাকে। এক পায়ে দাঁড়িয়ে 'কিৎকিৎ' শব্দ উচ্চারণ করে খেলাটি খেলতে হয়। প্রথম খেলোয়াড় প্রথম ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কড়িটি প্রথম ঘরে ছুড়ে রাখে। তারপর এক পায়ে দাঁড়িয়ে ডাক দিতে দিতে কড়িটি শেষ ঘর বা 'রাজার ঘর'-এ পা দিয়ে নিয়ে যায়। ক্রমান্বয়ে দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয় নম্বর ঘরে কড়িটি ফেলে পুনরায় একপায়ে কড়িটি ঠেলে প্রথম ঘরে যেতে হয়।

এভাবে সব ঘর শেষ হওয়ার পরে খেলোয়াড় পুনরায় 'কিৎকিৎ', 'চু' ও 'ডু' ডাক দিয়ে প্রথম থেকে ষষ্ঠ ঘর পর্যন্ত এক পায়ে যায়। তবে খেলার এই পর্যায়ে কড়ির প্রয়োজন হয় না। তারপর মুখ উঁচু করে দাগ না পাড়িয়ে সব ঘর হেঁটে অতিক্রম করতে হয়। খেলার এই অংশটিকে 'আউট' বলা হয়। খেলার শেষে 'হাউফ'/'হাফ' অংশে খেলোয়াড় রাজার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে, মাথা-মুখ উঁচু করে কড়িটি উল্টো দিক থেকে প্রথম ঘরের উদ্দেশে ছুঁড়ে দেয়। যদি কড়িটি প্রথম ঘরে পরে, তাহলে এক পাটি হয়। প্রথম খেলোয়াড় 'আউট' বা 'মরা' হলে দ্বিতীয় বা পরবর্তী খেলোয়াড় খেলার সুযোগ পায়।

খেলোয়াড় যদি কড়িটিকে নির্দিষ্ট ঘরে ফেলতে না পারে বা খেলোয়াড় যদি দাগে পা রাখে বা যদি একপায়ে ভারসাম্য রাখতে না পেরে দুটো পা বা হাত মাটিতে রাখে, তাহলে সেই খেলোয়াড় আউট হয়। এই খেলায় শারীরিক ব্যায়াম হয়। উত্তরবঙ্গ তথা গ্রামবাংলার অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা কিৎকিৎ।

কোকিল চন্দ্র রায়

আগামী সংখ্যায়

লেখা পাঠান হাতে লিখে নয়, টাইপ করে

ডুয়ার্স সংক্রান্ত আপনার কোনও লেখা থাকলে টাইপ করে পাঠান। আপনার লেখা সম্পাদকমণ্ডলীর পছন্দ হলে এই পত্রিকায় তা ছাপা হবে। লেখার বিষয়বস্তুর উপর ছবি থাকলে অবশ্যই পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা 'আড্ডাঘর', মুক্তাভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি। অথবা মেল করতে পারেন নিচের মেল আইডি-তে

editor.ekhonduars@ yahoo.com

এখন ডুয়ার্স

ডুয়ার্সের চা বাগান চিনুন

আজ জলপাইগুড়ির শান্তিপাড়া থেকে ডুয়ার্সের চা বাগানের পথে। রায়পুর, জয়পুর, ভান্ডিগুড়ি, শিকারপুর-ভান্ডারপুর চা বাগান। ডেঙ্গুয়াঝাড় পেরোতেই সোনালি ধানের খেত, ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কুঁড়েঘর, টিন বা খড়ের ছাউনি দেওয়া একচালা বা দোতালা ঘর। গ্রামীণ জীবনের খুঁটিনাটি দেখতে দেখতে চলেছি। কোথাও বা মাটির দেয়াল বেয়ে এঁকেবেঁকে চালে উঠেছে লাউগাছ, কোথাও আবার মাচার ভিতর থেকে উঁকি মারছে কচি ঝিঙে বা কাঁকরোলের সারি। ধানখেতের আল বেয়ে চলা বইয়ের ব্যাগ কাঁধে গ্রাম্য কিশোরী, খেতে কীটনাশক ছড়াতে ব্যস্ত কৃষক, ঘর-গৃহস্থালি সামলাতে ব্যস্ত রমণী বা সাইকেলে চেপে দূরে কোথাও কাজে যাওয়া নানান বয়সী পুরুষ। উত্তরের অরণ্যভূমি আজ ভ্রমণ পিপাসুদের এক মোহিনী মায়ার জালে আবদ্ধ করেছে। আর সেই কারণেই নানা ধর্ম, বর্ণের মানুষ দেশের নানাপ্রান্ত থেকে ছুটে আসছে জলদাপাড়া থেকে শুরু করে বক্সা, রায়মাটাং, গরুমারা, চাপড়ামারির আরণ্যক সৌন্দর্য উপভোগে। ঘন সবুজে ঘেরা বনাঞ্চল, নাম না জানা পাখি, হাতিদের অবাধ বিচরণ আর গহীন অরণ্যের নিস্তব্ধতা চেটেপুটে উপলব্ধি করার লোভ যেন আজ আবালবৃদ্ধবণিতার অস্থিমজ্জায়। দেখতে দেখতে চলে এলাম রায়পুর চা বাগান।

রায়পুর চা বাগান

বাঁচার অধিকার শুধুমাত্র জন্মগত অধিকার নয়। এটি একটি আইনসঙ্গত অধিকার। একইরকমভাবে আত্মরক্ষার অধিকারও। উত্তরবাংলার বন্ধ রায়পুর চা বাগানের কর্মহীন শ্রমিকদের মৃত্যু ঘটাতে বন্দুক থেকে তপ্ত সীসা ছুড়তে হয় না। বাগিচা মালিকের পেটোয়া মাফিয়া গুন্ডাকে শ্রেণী সংগ্রামরত শ্রমিকবাহিনীকে দমন করতে সংগ্রামের মঞ্চে উপস্থিত হতে হয় না। শ্রমিকেরা তাদের চা বাগিচার পর্ণকুটিরের ভাঙ্গা দাওয়ায় দিনের পর দিন একদানা ভাতের জন্য অপেক্ষা করে, শূন্য পাকস্থলির দাবি মানতে না পেরে ফুসফুসের শেষ রায়টুকুকে বার করে দিয়ে বাঁচার অধিকারের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির মুখে লাথি মারে। রায়পুর চা বাগিচার পরিস্থিতি এখন তাই। মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সরকার নিছক দর্শকই। ট্রেড ইউনিয়নের ট্রেডের সাইনবোর্ড আছে, আন্দোলনের নেতা আছে, নেতৃত্ব নেই। পদ আছে, দিশা দেখাবার জন্য পথপ্রদর্শক নেই। আইন আছে, শ্রমিকের বাঁচার জন্য আইনের দন্ড নেই। কারখানার গেটে তালা ঝোলানোর জন্য মালিকের হাতে তালা আছে, বন্ধ তালা খুলবার জন্য সরকার ও শ্রমিকের হাতে চাবি নেই। এদের সুখ আর ওদের অসুখ। এই মন্তব্যের সারকথা হলো চায়ের বাজারের সুফলের দরুন চা মালিকেরা সুখে থাকেন। অন্যদিকে আর্থিক অনটনের শিকার চা শ্রমিকেরা অস্বস্তিতে অর্থাৎ গভীর অসুখে আক্রান্ত।

রায়পুর টি গার্ডেনটি টাই এর সদস্য। বাগানে মোট ম্যানেজারিয়াল স্টাফ তিনজন। কোম্পানির হেডঅফিস শিলিগুড়িতে। স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন অনেকগুলি। কিন্তু প্রকৃত শ্রমিক স্বার্থে কারা কাজ করে বলা মুস্কিল। বাগানটির অবস্থান সদর ব্লকে। **আয়তন ৩৪৪.২১ হেক্টর**। চাষযোগ্য আবাদিক্ষেত্রও একই। আপরুটেড

এবং নতুন বপনযোগ্য আবাদিক্ষেত্র নেই বললেই চলে। মাত্র ২৮.৮৯ হেক্টর। ড্রেন এবং সেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চল ৪.৭৯ হেক্টর। মোট চাষযোগ্য **উৎপাদনক্ষম আবাদিক্ষেত্র ২৩৯.৮৩ হেক্টর**। প্রতি হেক্টর উৎপাদনযোগ্য আবাদিক্ষেত্র থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ২৪৬১ কেজি করে চা উৎপাদিত হয়। সেই উৎপাদিত চা এর গুণগত মান উন্নত নয়। বাজারে দামের ক্ষেত্রেও হেরফের হয়। যা খরচ সেই তুলনায় ব্যয় অনুযায়ী আয় হয় না বললেই চলে। এটি একটি অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত বাগান যেখানে শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিনিয়তই নিজেদের সঙ্গেই লড়াই চালাতে হয়। বাগানের শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা ৩৭৫। **মোট কর্মরত শ্রমিক ৬১৭ জন**। বহু বাড়িতে এখনো ইলেক্ট্রিক আসেনি। শ্রমিক আবাসগুলিতে শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। বাগানের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ।

কোনোরকমে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করার পর বুলবুলি ওঁরাও আর এগোতে পারেনি। রায়পুর চা বাগানের মেন্দা ওঁরাও এর বড় মেয়ে বুলবুলি ওঁরাও। বয়সজনিত কারণে বাবা আর কাজ করতে পারে না বলে সেই দায়িত্বটা এখন পালন করতে হয় বুলবুলিকে। সাত ভাই বোন তারা। মা পূর্ণিমাদেবী বুলবুলিকে চা পাতা তোলার কাজে সাহায্য করে। তাদের দুজনের উপার্জিত অর্থে সাংসারিক খরচ চালিয়ে নিতে হয়। রায়পুর চা বাগানের গুদাম লাইনের শিবু সাওয়াসী জানালেন, বাগান খোলা থাকলেও বাড়তি রোজগারের জন্য বাইরে মজুরের কাজ করতে যেতে হয়। আর্থিক দুরবস্থার জন্য ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা ঠিকমতো হচ্ছে না। মজুরি পেতে দেরি হচ্ছে। অতিরিক্ত মদ্যপান, অপুষ্টি জনিত সমস্যার কারণে বিভিন্ন রোগে ভুগছে শ্রমিকরা। গত কয়েকবছর ধরে চা বাগিচাটি নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মতো পরিস্থিতি অর্জন করার চেষ্টা করছে।

রংধামালি-জলপাইগুড়ি সিটি অটোর ভিতর ঠাসাঠাসি ভিড় করে গাড়ির মাথায় ব্যাগের স্তুপের উপরেও অনেকে বসে দরজা-জানালা এমনকি পিছনে ঝুলেও অনেকে চলে যাচ্ছেন বাগিচা ছেড়ে এমন দৃশ্য চোখে পড়ল। কৌতূহলী হয়ে খবর নিলাম এরা কোথায় যাচ্ছে। জানলাম ওরা কাজের সন্ধানে যাচ্ছে রাজ্যের বাইরে। বাগানের রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে অটো চলে যেতেই অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাদের কেউ আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন আবার কেউবা ওর দিকে চেয়ে হাত নেড়েই চললেন। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে, আবার রায়পুর চা বাগানের দরজা খুলে যায়। আবার বন্ধ হয়। আবার কিছুদিন পর বাগান খোলে। এই ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়, মালিকপক্ষের অভিযোগ থাকে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে। তাদের বক্তব্য শ্রমিকদের একাংশের নিজেদের মধ্যে বিরোধের কারণে পরিচালনার কাজে সমস্যা সৃষ্টি হয়। একাংশ শ্রমিক পুরোদিনের কাজ করে না। আবার তখন বাগানে স্থায়ী শ্রমিকের বদলে কাজে লাগানো হচ্ছে অস্থায়ী সস্তার শ্রমিকদের। অন্যদিকে চা-শ্রমিকদের বক্তব্য, শীতের শুখা মরসুমে চা পাতা ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। শীতকালে পাতা তোলা বন্ধ হয়ে গেলে মালিকের অনুপস্থিতিতে চলবে কেমন করে? সেটা ভেবেই রায়পুরের শতাধিক বাসিন্দা ভিন রাজ্যেপাড়ি দেয়। লাভের কড়ি পকেটে পুরে মজুরি, বেতন এবং বোনাস বকেয়া রেখে বাগান ছেড়ে মালিকপক্ষ চলে যায়।

“রায়পুর চা বাগানের গুদাম লাইনের শিবু সাওয়াসী জানালেন, বাগান খোলা থাকলেও বাড়তি রোজগারের জন্য বাইরে মজুরের কাজ করতে যেতে হয়। আর্থিক দুরবস্থার জন্য ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা ঠিকমতো হচ্ছে না। মজুরি পেতে দেরি হচ্ছে। অতিরিক্ত মদ্যপান, অপুষ্টি জনিত সমস্যার কারণে বিভিন্ন রোগে ভুগছে শ্রমিকরা। গত কয়েকবছর ধরে চা বাগিচাটি নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মতো পরিস্থিতি অর্জন করার চেষ্টা করছে।”

কিছুদিন আগে জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী এবং জলপাইগুড়ি জেলার সদর হাসপাতালের চিকিৎসক শিবাজী রায়ের সহযোগিতায় ৪০-৫০ জন ছাত্রছাত্রীর একটা দল জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে অনতিদূরে রায়পুর চা বাগানের ৩০০ টি পরিবারের উপর সার্বিক স্বাস্থ্যসমীক্ষা এবং মেডিকেল ক্যাম্প করতে যায়। ছাত্ররা শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, বিদ্যুত, জ্বালানি, পুষ্টি, আবাসন, নিবিড় স্বাস্থ্যবিধান, নিকাশি- সব বিষয়ে খুঁটিনাটি তথ্যসমীক্ষার মাধ্যমে জোগাড় করে এই সমীক্ষা রিপোর্ট সরকারি স্তরে পাঠিয়ে সরকারকে পরিকল্পনা রূপায়ণে কাজ করার আবেদন জানায়। কলেজের অধ্যাপক সৌপায়ন মিত্রর কাছ থেকে জেনেছিলাম পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন পরিষেবা যাতে চা বাগানের শ্রমিকরা পান সেই লক্ষ্যে চা বাগান শ্রমিকদের জন্য তারা প্রকল্প প্রণয়ন করেছেন। রায়পুর চা বাগানের জমি, কৃষিব্যবস্থা, নিকাশি, প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা, চা বাগানের মেশিনের ব্যবহার জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রছাত্রীদের চিন্তাভাবনাকে যেমন আলোড়িত করেছে, তেমনি কলেজের পুঁথিগত পড়াশোনার বাইরে হাতে কলমে এই ধরনের সমীক্ষার কাজ যদি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অন্তর্গত চা বাগিচাগুলিতে করা যায় তাহলে সত্যিই যে উপকার হবে এটা প্রমাণিত হয়েছে। যেমন শুভদীপ এর সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানতে পারলাম, স্প্রেইং মেশিনে যদি একটা লিভারকে সামান্য প্রকৌশলগত পরিবর্তন করা যায় তাহলে প্রকৌশলের ক্ষেত্রে এই সামান্য পরিবর্তন করে পাম্পিং পদ্ধতিকে আরও সহজতর করা যেতে পারে। একজন শ্রমিককে রিফিল করার জন্য বারবার যাতায়াত করতে হয়, যাতে সময় ও এনার্জি ক্ষয় হয়, শ্রমিক ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সোলার প্রোজেক্ট ব্যবহার করে পাম্পিং স্টেশন থেকে সরাসরি পাইপের মাধ্যমে স্প্রে করার কথা ভাবা যেতেই পারে। এইভাবেই চিন্তভাবনা করেছিলেন জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্ররা। কিন্তু চিন্তাভাবনা নেই রায়পুর চা বাগানের ম্যানেজমেন্টের, মালিকপক্ষের। পরিস্থিতি ভয়ংকর, কিন্তু কবে ঘুম ভাঙবে মালিক পক্ষের?

নেই এর স্বর্গরাজ্যে রায়পুর চা বাগান। রায়পুর বাগানে কোনও হাসপাতাল নেই। কাজ চালানর মতো ডাক্তার ও ডিসপেন্সারি থাকলেও পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড নেই। আইসোলেশন ওয়ার্ড, মেটারনিটি ব্যবস্থা নেই। অ্যাম্বুলেন্স নেই। ওষুধ সরবরাহ হয় না বললেই চলে। উন্নত পথ্য, ডায়েট চার্ট শ্রমিকদের কাছে স্বপ্ন। লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার নেই। ক্রেশ দায়সারাভাবেই চলে। জলের ব্যবস্থা নেই, শৌচাগার নেই, ক্রেশে দুধ বিস্কুট দেওয়া হয় না। শিশুদের পোশাক দেওয়া হয় না। পানীয় জল আছে তবে পানের যোগ্য কিনা সন্দেহ আছে। ছাত্রদের স্কুলে নিয়ে যাবার কোনরকম পরিবহনের ব্যবস্থা নেই। শ্রমিকেরা সময়ে সময়ে মাইনেই পাননা, বোনাস পাবেন কেমন করে? এইভাবেই চলছে রায়পুর বাগান এবং আশ্চর্য ব্যাপার হল শ্রমিকেরা এই ভাবেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

জয়পুর চা বাগান

জলপাইগুড়ি সদর মহকুমার জয়পুর চা বাগানটির পরিচালক গোষ্ঠী সানি ভ্যালি টি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড।

বাগানটি আইটিপি-এর সদস্য। বর্তমান কোম্পানি ১৯৫৭ সালে বাগানটির দায়িত্বভার গ্রহণ করে। সেই অনুযায়ী বাগানটি অত্যন্ত পুরনো। আয়তন ৩৬৫.০৮ হেক্টর। চাষযোগ্য আবাদিক্ষেত্র তাই। কিষাণ কল্যাণী গ্রুপের জয়পুর চা বাগানটি এবং সানি ভ্যালি কোম্পানির মালিক এস কে কল্যানীর ঠিকানা দিনবাজার, জলপাইগুড়িতেই। হেড অফিসও জলপাইগুড়িতে। এক্সটেন্ডেড জমি বাগানে নেই বললেই চলে। মাত্র ১১ হেক্টর। ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় আপরুটেড এবং নতুন বপনযোগ্য আবাদি ক্ষেত্রের হিসেব পেলাম ২৬.৩৮ একরের মতো। ড্রেন এবং সেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চল জানলাম ২৪৩.৫১ হেক্টর। **মোট চাষযোগ্য উৎপাদনক্ষম আবাদি ক্ষেত্র ৩১১ হেক্টর**। তবে প্রতি হেক্টর উৎপাদনযোগ্য এবং ড্রেন ও সেচযুক্ত প্ল্যান্টেশন এরিয়া থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ২৫০৮ কেজি করে চা উৎপাদিত হয় যা অন্যান্য বাগানগুলির থেকে গড়ে কিছুটা বেশি।

স্থায়ী শ্রমিক ৬৩৫। তারা দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমাণ পাতা তোলার বিনিময়ে নির্দিষ্ট মজুরি পায়। বিগত আর্থিক বছরে বিঘা শ্রমিক বা অস্থায়ী শ্রমিক ছিল ৫০০ জনেরও বেশি। পার্শ্ববর্তী বাগান থেকে তাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছিল। **মোট কর্মরত শ্রমিক ৭৩৯**। জয়পুর চা বাগিচার নিজস্ব উৎপাদিত চা ৪০ লাখ কেজি এবং ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চা ৯ লাখ কেজি বলে জানা গেলো। বহিরাগত বাগান থেকে কেনা কাঁচা চা পাতায় তৈরি বিক্রয়যোগ্য চা এর পরিমাণ ৩ লাখ কেজি। ফ্যাক্টরিতে তৈরি **মোট বিক্রয়যোগ্য চা এর পরিমাণ ১২ লাখ কেজি**। বাগিচায় উন্নত কোয়ালিটির ইনঅরগানিক সিটিসি চা উৎপাদিত হয়।

গত চার বছরে বাড়ি-ঘরদোর সংস্কারের জন্য ১০ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছে বাগান কর্তৃপক্ষ। বাগিচায় হাসপাতালের সংখ্যা একটি। ডিসপেনসারিও একটি। আলাদাভাবে পুরুষ এবং মহিলা আইসোলেশন ওয়ার্ডের ব্যবস্থা আছে ডিসপেন্সারিতে। অ্যাম্বুলেন্স আছে। কিছুটা দূরে বেলাকোবাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। আছে জলপাইগুড়ি সদর হসপিটাল।পরিকাঠামোবিহীন এই চা বাগিচায় লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার নেই। বাগিচায় ক্রেশ আছে একটি মাত্র। পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা নেই। ক্রেশে দুধ বিস্কুট বা পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা হয় না বললেই চলে।পানীয় জল পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকলেও সময়ে সময়ে তা ব্যবহার যোগ্য নয়। বাগিচায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। দূরবর্তী স্থানে আছে, কিন্তু সেখানে পাঠাবার জন্য বাগিচার নিজস্ব পরিবহণ ব্যবস্থা যা আছে তাতে সবাইকে পড়াশুনার জন্য বিদ্যালয়গুলিতে পাঠানো যায় না। একটি মাত্র ট্রাকের ওপর বাগিচা কর্তৃপক্ষ নির্ভরশীল। বাগিচায় ক্লাব আছে। খেলার মাঠ আছে।

জানা গেল বাগিচায় বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। মজুরি চুক্তি অনুযায়ী দেওয়া হলেও মাঝে মধ্যে অর্থনৈতিক কারণে কমবেশি বকেয়া থাকে। শ্রমিকদের রেশনের বকেয়া থাকে না কারণ এখন সরকারের উদ্যোগে চা বাগিচাগুলিতে নির্দিষ্ট সময়ে সেলফ হেল্প গ্রুপগুলির মাধ্যমে রেশন পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এর জন্য প্রতিটি বাগানে রেশন সরবরাহ ইউনিট বা গুদামঘর সরকারি উদ্যোগে খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রমিকদের জ্বালানি, চপ্পল ছাতা কম্বল, নিয়মিত সরবরাহ করা হয়। বকেয়া মজুরির এরিয়ার দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। সময়ে সময়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ দেখা যায়।

“পরিকাঠামোবিহীন জয়পুর চা বাগিচায় লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার নেই। বাগিচায় ক্রেশ আছে একটি মাত্র। পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা নেই। ক্রেশে দুধ বিস্কুট বা পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা হয় না বললেই চলে।পানীয় জল পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকলেও সময়ে সময়ে তা ব্যবহার যোগ্য নয়। বাগিচায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই।”

জলপাইগুড়ি জেলা হিসাবে ১৮৬৯ সালে আত্মপ্রকাশ করার পর প্রশাসনিক সুবিধার জন্য জেলার রেগুলেশন অংশকে চারটি থানায় ভাগ করা হয়। হান্টারের বিবরণী থেকে জানা যায়, রেগুলেশন অঞ্চলের চারটি থানা ছিল শিলিগুড়ি বা সন্ন্যাসী কাটা, ফকিরগঞ্জ, বোদা ও পাটগ্রাম। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের বিবরণী থেকে জানা যায়, সন্ন্যাসীকাটা থানার আয়তন ছিল ২৭৭ বর্গমাইল এবং এর মধ্যে গ্রামের সংখ্যাও ছিল উল্লেখ করার মতো। পরবর্তীকালে থানা এলাকাকে ছোট করার পদ্ধতি শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলাকে তিনটি সার্কেলে ভাগ করা হয়। এগুলি হল জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার। জলপাইগুড়ি সার্কেলের মধ্যে জলপাইগুড়ি, বোদা ও রাজগঞ্জ থানাকে নিয়ে আসা হয়। তবে বোদা ও রাজগঞ্জ থানার অঙ্গচ্ছেদ করে দেবিগঞ্জ ও তেঁতুলিয়াতে স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন ফাঁড়ি স্থাপন করা হয়। ইংরেজ আমলে রাজগঞ্জ থানার আয়তন এক থাকে। স্বাধীন ভারতবর্ষে রাজগঞ্জ থানার আর একবার অঙ্গহানি হয়। বর্তমানে রাজগঞ্জ থানার উত্তরে ভক্তিনগর থানা, পূর্বে মাল থানা, দক্ষিণে জলপাইগুড়ি থানা ও বিদেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং পশ্চিমে দার্জিলিং জেলা ও বাংলাদেশ। তাই রাজগঞ্জ থানা ভৌগোলিক দিক দিয়ে আন্তর্জাতিক করিডর। বিভিন্ন নদীঘেরা এই অঞ্চলে কৃষিপণ্য তথা পাটের গুরুত্বপূর্ণ বাজার ছিল। করতোয়ার পারে একটি বাজার বা গঞ্জ ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বৈকুণ্ঠপুর রাজাদের আমলে নির্মিত বাজার বা গঞ্জ থেকেই রাজগঞ্জ নামকরণ বলে অনুমান। তবে এই অঞ্চলে ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে সরকারি কাগজপত্রে সন্ন্যাসীকাটা ব্যবহার করা হত। তবে কিছুকাল পর থেকে রাজগঞ্জ নামটি বেশি ব্যবহার পেতে থাকে।

কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ এর সাথে সাথে এই থানা এলাকার উন্নতমানের পাট ইংরেজদের লভ্যাংশকে স্ফীত করে তুলেছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। কারণ রাজগঞ্জের থানা এলাকার সঙ্গেই বহির্দেশের যোগাযোগ বহু প্রাচীন। করতোয়ার তীরবর্তী পুরনো রাজগঞ্জ হাটের রপ্তানিযোগ্য মূল ফসল ছিল পাট। অল্প পরিমাণ ধান, আলু, গুড় রপ্তানি হত। আমদানি হত কাপড়, মসলা, চিনি, লবণ ইত্যাদি। অতীত গৌরব হারিয়ে ফেললেও পুরনো নামে রাজগঞ্জ হাট এখনো বসে সপ্তাহে দু'দিন। সন্ন্যাসীকাটা হাট, পাগলার হাট, সরস্বতীপুর হাট, ঘরঘড়িয়া হাট, সুখানিহাটের অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে। এরা তাদের অতীত গৌরব হারাতে বসেছে। বলাই বাহুল্য দেশবিভাগের মারাত্মক অভিশাপ এসে পড়েছে থানা এলাকার অন্তর্গত পুরনো হাট গুলির উপর। এই হাটগুলির সঙ্গে সঙ্গে এই থানার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের বিনোদন এর মূল উৎস ছিল গ্রামীণ মেলাগুলি। শিব চতুর্দশীর দিন রাজগঞ্জ থানা এলাকার পশ্চিম দিকে শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে বসত ভদ্রেশ্বর মেলা। রাজগঞ্জ থানা এলাকার অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুরে জঙ্গলমহলের বেশিরভাগ অংশটাই পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর বাংলায় যে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ হয়েছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল বৈকুণ্ঠপুর এর নাম। বৈকুণ্ঠপুর লাগোয়া সন্ন্যাসীকাটা গ্রামটি এখনো আছে। সন্ন্যাসী ভবানী পাঠক এর নামেই স্থানটির নাম বলে অনেকের অনুমান। আবার অনেকেই মনে করেন ব্যাঘ্রচর্ম ধারণকারী সন্ন্যাসী দেবতা মহাদেবের নামেই এই স্থানটির নামকরণ। ইতিহাস এখনো নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারেনি। তবে

> শিকারপুর-ভান্ডারপুর চা বাগানে বাৎসরিক বোনাসের পরিমাণ ১৫ শতাংশ। অন্যান্য বাগিচাগুলি থেকে অনেক কম হলেও নিয়মিত প্রদান করা হয়। বোনাস নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও ছোট বাগান হিসাবে মালিকপক্ষের এই বোনাস প্রদান শ্রমিকেরা মেনে নিতে বাধ্য হয়। মাঝে মধ্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ দেখা দিলেও বোনাস বা মজুরি প্রদান নিয়ে এই বাগিচায় বড় ধরনের কোনও ঘটনার খবর পাওয়া এখনও পর্যন্ত যায়নি।

নির্মাণ ধোঁয়াশাপূর্ণ হলেও মন্দিরটি বেশ প্রাচীন। মন্দিরটির ভিত পাকা, বাকি সব কাঠ।

শিকারপুর-ভান্ডারপুর চা বাগান

জলপাইগুড়ি সদর মহকুমার রাজগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত শিকারপুর ভান্ডারপুর চা বাগানের অবস্থান অতীব মনোরম পরিবেশে। বেলাকোবা থেকে এই চা বাগানে যাওয়া যায়। পরিচালক গোষ্ঠী শিকারপুর-ভান্ডারপুর টি এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। বাগানটি ডিবিআইটিএ-এর সদস্য। ২০১০ সালে বর্তমান কোম্পানি বাগানটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল। সেবক রোড দুমাইল শিলিগুড়িতে কোম্পানির হেড অফিস। বাগানে স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন সাতটি। তবে তার মধ্যে শাসকদলের ট্রেড ইউনিয়ন অধিক শক্তিশালী। চা বাগানের **আয়তন ৯০৪.৯ হেক্টর**। চাষযোগ্য আবাদীক্ষেত্রও তাই। এক্সটেন্ডেড জমি নেই বললেই চলে। আপরুটেড এবং নতুন বপনযোগ্য আবাদি ক্ষেত্র ২১২.৭৭ হেক্টর। প্রতি হেক্টর জমি পিছু ১৪৫৬ কেজি করে চা উৎপাদিত হয়। শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা এখন কমবেশি হাজারের কাছাকাছি হবে। অনেকেই চা বাগানের কাজ ছেড়ে দিয়ে বিকল্প পেশা গ্রহণ করছে। **মোট কর্মরত শ্রমিক ১৫৫১ জন**। এই তথ্য পরিসংখ্যান কমবেশি এদিক ওদিক হতেই পারে।

শিকারপুর চা বাগিচায় নিজস্ব উৎপাদিত চা গড়ে ২৫-৩০ লাখ কেজি এবং ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয় যোগ্য চা ৫-৬ লাখ কেজি। বহিরাগত বাগান থেকে সংগৃহীত এবং কেনা কাঁচা চা পাতায় প্রস্তুত বিক্রয়যোগ্য চায়ের পরিমান গড়ে ৫০০০০ কেজি। ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চায়ের পরিমাণ সর্বমোট গড়ে ৬-৭ লাখ। উৎপাদিত চা এর প্রকৃতি অনুযায়ী এই বাগানে সিটিসি চা উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত চা প্রকৃতিতে ইনঅরগানিক। চায়ের মান খুব একটা খারাপ না। বাগানটি চরিত্রগত দিক থেকে দুর্বল অর্থনৈতিক ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। শিকারপুর ভান্ডারপুর টি গার্ডেন এস জি আর ওয়াই বা এম জি এন আর ই জি এস এর সুবিধা পায়। ব্যাঙ্কের কাছে বাগানটি দায়বদ্ধ। আর্থিক সুবিধা প্রদানকারী ব্যাংকের নাম ইউ বি আই। বাগান পরিচালনার কার্যকর মূলধন আসে ব্যাঙ্কসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের থেকে।

একটি। ডিসপেনসারি দুটি। অপারেশন থিয়েটার নেই। মেটারনিটি ওয়ার্ড নেই বললেই চলে। মেল ওয়ার্ড এবং ফিমেল ওয়ার্ড নেই। নেই আইসোলেশন ওয়ার্ডও। মেটারনিটি ওয়ার্ড দায়সারাভাবে থাকলেও এখানে চিকিৎসা হয় না। স্থানীয় প্রাইমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাগিচায় গত ১০ বছরের ওপরে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা নেই। বাগিচায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। ডাক্তারও আছে। ওষুধ সরবরাহ করা হলেও শ্রমিকদের অভিযোগ নির্দিষ্টি রোগের জন্য নির্দিষ্টি ওষুধ সরবরাহ করা হয় না।

ক্রেশের অবস্থা চলনসই। পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা রয়েছে। শৌচাগার নেই। দুধ বিস্কুট বা শিশুদের পুষ্টিকর খাবার, শিশুদের নিয়মিত পোশাক প্রদান স্বপ্ন। কোনো পরিষেবাই মহিলা শ্রমিকেরা বা তাদের শিশুরা পায় না। পানীয়জল সময় সময় ব্যবহারযোগ্য নয়। বাগিচায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই, তবে পার্শবর্তী অঞ্চলে আছে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের সেই বিদ্যালয়ে নিয়ে যাবার কোনও পরিবহণ নেই। কর্তৃপক্ষ চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেন না। বাৎসরিক বোনাসের পরিমাণ ১৫ শতাংশ। অন্যান্য বাগিচাগুলি থেকে অনেক কম হলেও নিয়মিত প্রদান করা হয়। বোনাস নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও ছোট বাগান হিসাবে মালিকপক্ষের এই বোনাস প্রদান শ্রমিকেরা মেনে নিতে বাধ্য হয়। মাঝে মধ্যে ছোটখাটো ক্ষোভ-বিক্ষোভ দেখা দিলেও বোনাস বা মজুরি প্রদান নিয়ে এই বাগিচায় বড় ধরনের কোনও ঘটনার খবর পাওয়া এখনও পর্যন্ত যায়নি।

ভান্ডিগুড়ি চা বাগান

শিকারপুর- ভান্ডারপুর চা বাগিচা লাগোয়া ভান্ডিগুড়ি চা বাগান। বাগানটি ছোট হলেও সুনামের অধিকারী। শ্রমিকদের সঙ্গে ম্যানেজমেন্টের সুন্দর এবং সহজ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে বাগানের কাজেও গতি এসেছে। জলপাইগুড়ি সদর মহকুমার ভান্ডিগুড়ি টি গার্ডেনটির পরিচালক গোষ্ঠী গুডউইল টি এন্ড ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড। বাগানটি আই টি পি এর সদস্য। বর্তমান কোম্পানি ১৯১৯ সালে বাগানটির দায়িত্বভার গ্রহণ করে। কোম্পানির হেড অফিসও জলপাইগুড়িতে। বাগানে প্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন পাঁচটি। মোট কর্মরত শ্রমিক ৭৭০ জন। চা বাগিচার হাসপাতালটি ছোটো। ডিসপেনসারির সংখ্যা একটি। আলাদাভাবে পুরুষ এবং মহিলা ওয়ার্ড এর ব্যবস্থা আছে। পুরুষ ওয়ার্ডের সংখ্যা ছয়টি, মহিলা ওয়ার্ড সংখ্যা পাঁচটি। আইসোলেশন এবং মেটারনিটি ওয়ার্ড আছে একটি করে। বাগিচার নিজস্ব হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার আছে। বাগিচায় অ্যাম্বুলেন্স আছে। বাইরে চিকিৎসার জন্য কিন্তু প্রচুর শ্রমিককে রেফার করা হয়। বছরে প্রায় ৪০০ জন। বাগিচায় ডাক্তার আছে। লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার আছে। ক্রেশ আছে। জলের ব্যবস্থাও আছে। বাগিচায় গত অর্থবর্ষে নিয়মমতই টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ড খাতে জমা পড়েছে। বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ড বকেয়া নেই। মজুরি চুক্তি অনুযায়ী দেওয়া হয়। শ্রমিকদের মজুরি রেশন বকেয়া নেই। ভান্ডিগুড়ি বাগিচার আয়তন ৩৩২.৩৬ একর। **মোট চাষযোগ্য উৎপাদনক্ষম আবাদি ক্ষেত্র ৩০০.১৯ হেক্টর**। প্রতি হেক্টর উৎপাদনযোগ্য এবং ড্রেন ও সেচযুক্ত প্ল্যান্টেশান এরিয়া থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ২৬৩০ কেজি করে চা উৎপাদিত হয়। ভান্ডিগুড়ি চা বাগিচার নিজস্ব উৎপাদিত চা গড়ে ৩৮-৪০ লাখ কেজি এবং ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চায়ের পরিমাণ ৯ লাখ কেজি। বহিরাগত বাগান থেকে

সংগৃহীত এবং কেনা কাঁচা চা পাতায় প্রস্তুত বিক্রয়যোগ্য চায়ের পরিমাণ ৩ লাখ কেজি। ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চায়ের পরিমাণ ১২ লাখ কেজি। উৎপাদিত চায়ের প্রকৃতি অনুযায়ী এই বাগানে উন্নত কোয়ালিটির সি টি সি চা উৎপাদিত হয়। বাগানটি চরিত্রগত দিক থেকে মাঝারি মানের বাগান। বাগানটির সুনাম আছে, তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যথোপযুক্ত জায়গা পেতে গেলে আরও অনেক পরিশ্রম করতে হবে।

ভীষ্মলোচন শর্মা

ডুয়ার্সের বইপত্র

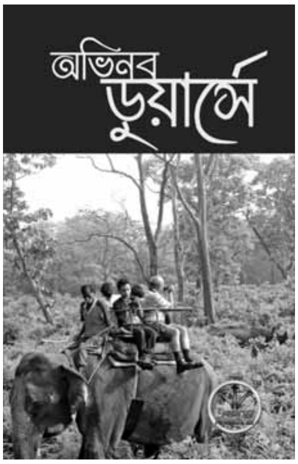

অভিনব ডুয়ার্সে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২০০ টাকা

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি।
দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা

চায়ের ডুয়ার্স কী চায়?
গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা

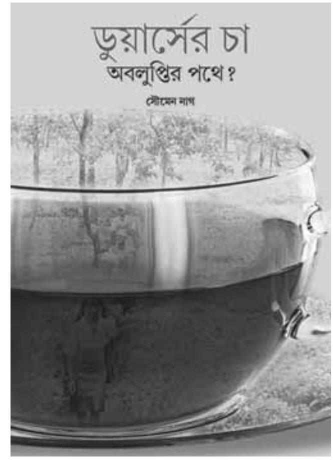

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা

ডুয়ার্সের সেরা তিন লেখকের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো।
সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা

চারপাশের গল্প।
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা

লাল ডায়েরি।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা

প্রথম পেপারব্যাক থ্রিলার

লাল চন্দন নীল ছবি।
অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা

পকেট পেপারব্যাক

অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন।
বিপুল দাস। ৫৫ টাকা

পকেট পেপারব্যাক

মেঘের পর রোদ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা

ছোটদের জন্য প্রথম বই

সবুজ মনের গল্পগুলি। রীতা রায়। ১২৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান
অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা।
অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা

পকেট পেপারব্যাক

কুহুলিয়াদের দেশে।
সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

বাড়িতে বসে বই পেতে গেলে মেল করুন **ekhondurars@yahoo.com**

বই আপনার কাছাকাছি কোথায় পাওয়া যাবে জানতে ফোন করুন
উত্তরবঙ্গে ৯৮৩০৪১০৮০৮, কলকাতায় ০৩৩-৪০৭০ ১৪৪৪

EKHON DUARS, Vol-5, Issue-2 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। পর্ব-২১। এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।

কাহিনি : বৈকুণ্ঠ মল্লিক, ছবি : দেবরাজ কর

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.